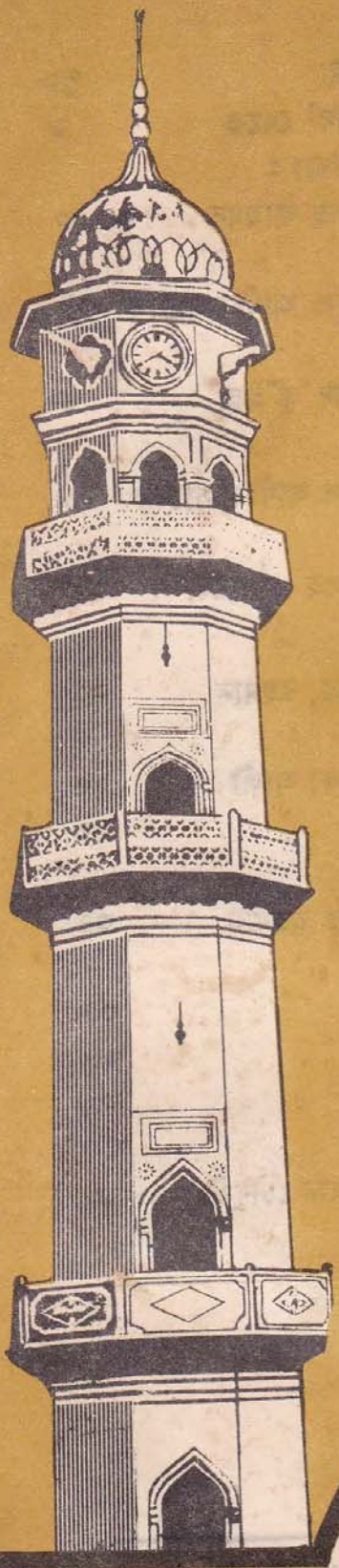

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৯ বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা

১১ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪১৮ হিঃ ॥ ৩১শে ভাদ্র, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

# সূচিপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃঃ |
|---|---|---|
| তরজমাতুল কুরআন ( তফসীর সহ ) | : 'কুরআন মজীদ' থেকে | ১ |
| হাদীস শরীফ : | : অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ | ৩ |
| অমৃত বাণী : | : অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক | ৪ |
| হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) | : অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া | ৬ |
| জুমুআর খুৎবা | : অনুবাদ : | |
| সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' ( আইঃ ) | মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক | ১০ |
| হযরত রসূল করীম ( সাঃ )-এর খোদা-প্রেম ও তাঁর ইবাদত | : মাওলানা সালেহ আহমদ | ১৮ |
| ইনকিলাবে হাকীকী ( প্রকৃত বিপ্লব ) | : অনুবাদ : | |
| মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) | মোহাম্মদ মুতিউর রহমান | ২১ |
| পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত | : মোহাম্মদ মোস্তফা আলী | ২৫ |
| পত্র-পত্রিকা থেকে | : | ২৬ |
| ছোটদের পাতা | : পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান | ৩৪ |
| কবিতা : বুলন্দ হিম্মতি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) | : | ৩৫ |
| সংবাদ | : | ৩৮ |
| আস্হাবে কাহাফের পাতা | : আররকীম | ৩৯ |
| হোমিওপ্যাথি : সদৃশ-বিধান চিকিৎসা | : অনুবাদ : | |
| মূল-হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) | : আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী | ৪৩ |
| সম্পাদকীয় | : | ৫১ |



**সম্পাদনা পরিষদ**

মোহতরম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী


* আপনার বর্তমান বছরের চাঁদা ১লা জুলাই থেকে পাওনা হয়েছে।

** অনুগ্রহ করে হিসাব দেখে চাঁদা দিয়ে পাক্ষিক আহমদীর সাথে সহযোগিতা করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ  وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

৫৯তম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ : ১৫ই তাবূক, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ৩১শে ভাদ্র, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

## তরজমাতুল কুরআন

## সূরা আন্ নিসা—৪

১০৭। এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। (৬৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১০৮। এবং তুমি তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিও না যাহারা নিজেদের (৬৬৫) প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না তাহাকে যে বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।

১০৯। তাহারা মানুষ হইতে নিজেদের (পরিকল্পনা) গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ্ হইতে তাহারা গোপন করিতে পারে না, অথচ তিনি তখনও তাহাদের সহিত থাকেন যখন তাহারা রাত্রিকালে এমন কথা সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করে যাহা তিনি পসন্দ করেন না। বস্তুতঃ তাহারা যে কর্ম করে আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

১১০। দেখ! তোমরা (৬৬৬) এমনই লোক যে ইহজীবনে তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক

---

৬৬৪। 'ইস্‌তিগ্‌ফার' সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবি-কাঠি। ইহার অর্থ কেবল মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনাই নহে। ইহার ফলে, এমন সব কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়, যাহা দ্বারা দুর্বলতা ও পাপরাশি ঢাকিয়া যায়।

৬৬৫। 'আন্‌ফুসাহুম' অর্থ 'তাহাদের ভ্রাতৃগণ'ও হইতে পারে (২:৮৫, ৮৬, ৪:৬৭)। এই আহ্বান সকলের প্রতিই, যেমন পূর্ববর্তী আয়াতগুলির আহ্বানও সাধারণভাবে সকলের জন্য।

৬৬৬। এই আয়াতের 'আনতুম' (তোমরা) শব্দটি দেখাইয়া দিতেছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলির আহ্বান, মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি নহে, বরং সর্ব সাধারণ মুসলমানের প্রতি

করিতেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষ হইয়া আল্লাহ্‌র সহিত কে বিতর্ক করিবে অথবা কে হইবে তাহাদের পক্ষে অভিভাবক ?

১১১। এবং যে কেহ মন্দ কর্ম করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্‌কে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় হিসাবে পাইবে।

১১২। এবং যে কেহ পাপ অর্জন করে, সে উহা কেবল নিজের বিরুদ্ধেই অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১১৩। আর যে কেহ কোন অপরাধ বা পাপ (৬৬৭) অর্জন করে, অতঃপর উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় সে মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে। ১৬ রুকু

---

জানানো হইয়াছে। মহানবী (সাঃ) সম্বন্ধে এই কথা কখনও প্রযোজ্য হইতে পারে না যে, তিনি অসৎ লোকের সপক্ষে তর্ক বা ঝগড়া করিবেন। কুরআন তাঁহাকে আহ্‌বান করিয়া কথা বলে, যেহেতু মু'মেনগণের জন্য আদেশ-নিষেধাবলীর ঐশী-বাণী তাঁহারই কাছে অবতীর্ণ হয়।

৬৬৭। 'খাতিয়াহ্‌' (ত্রুটি) এবং 'ইসম' (পাপ) দুইটি শব্দ এই আয়াতে পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম শব্দটি 'খতিয়াহ্‌' ইচ্ছাকৃতও হইতে পারে, অনিচ্ছাকৃতও হইতে পারে এবং তাহা দোষকারীর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দ 'ইসম' ইচ্ছাকৃত পাপকে বুঝায় এবং ইহার পরিধি অন্যান্যকে আবেষ্টন করে। তদুপরি প্রথম শব্দটি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যে অবহেলা বুঝায়, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটি আল্লাহ্‌ ও মানুষের প্রতি অপরাধ সাধনকে বুঝাইয়া থাকে। এই কারণেই দ্বিতীয়টির শাস্তি, প্রথমটির শাস্তি হইতে গুরুতর। ২:৮২ এবং ২:১৭৪ দেখুন। অপরাধ কিংবা পাপ করা দ্বিগুণ শাস্তিযোগ্য হইয়া পড়ে—যখন দোষী ব্যক্তি নিজের পাপকে নিরপরাধীর কাঁধে চাপাইতে চায়। সেই জন্যই এইরূপ করাকে কেবল 'বুহ্‌তান' (মিথ্যা অপবাদ) বলা হয় নাই, বরং 'ইস্‌মুম্মুবীন' (সুস্পষ্ট পাপ) ও বলা হইয়াছে।

---

"আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবন প্রাপ্তির একটি শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তাঁর মাধ্যমে জারীকৃত স্থায়ী কল্যাণ চিরপ্রবহমান। যে ব্যক্তি এ যুগেও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ করে সে নিঃসন্দেহে কবর (আধ্যাত্মিক মৃত্যু) থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং তাঁকে এক আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করা হয়।"

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২২১)

# হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

**কুরআন ঃ**

و لا تمش فی الارض مرحا - ان الله لا یحب کل مختال فخور (لقمان ایت ۱۹)

অর্থাৎ এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না, কোন দাম্ভিক-অহংকারকারীকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। (লোকমান : ১৯)

**হাদীস ঃ**

لا یوم الرجل فی سلطانه و لا یجلس علی تکرمته فی بیته الا باذنه (ترمذی)

অর্থাৎ কেউ অন্যের কর্তৃত্বের স্থানে গিয়ে যেন ইমামতী না করে এবং কারো বাসায় গিয়ে তার (গৃহ মালিকের) বসার স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে না বসে। (তিরমিযী)

**ব্যাখ্যা ঃ**—ইসলাম মানব জীবনের উন্নতর বিকাশ চায়। এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে চায় যেখানে মানবতার বিকাশের সাথে সাথে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উন্নতির পথের সহায়ক এ প্রতিটি বিষয়-বস্তুকে ইসলাম পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছে। মানবতার বিকাশের জন্য বিনয়ী হওয়া আবশ্যকীয়। বিনয়ই মানুষের মাঝে মানুষের জন্য প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তা'লা বলেছেন, তোমার চলা ফেরার মাঝে যেন অহংকারের ছাপ না থাকে। কেননা, আল্লাহ্ অহংকারকে পসন্দ করেন না। সাধারণতঃ যে অহংকারী সে কখনও বলে না যে, আমি অহংকারী বা অনেকেই যে অহংকারী তা-ও স্বীকার করে না। অহংকারীর পরিচয় তার আমলে। শুধু যে জাগতিক বিষয়েই মানুষ অহংকারী হয় তা নয় বরং আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও মানুষ অহংকারী হয় যা অত্যন্ত ভয়াবহ। আধ্যাত্মিক অহংকার মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করে। হযরত নবী করীম (সাঃ) তাঁর মহামূল্যবান বাণীতে অহংকারের দু'টি চিহ্ন বর্ণনা করেছেন। একতো একজন যত বড়ই আলেম হোন না কেন তিনি যেন কোথাও গমন করে স্থানীয় ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকে ইমামতী না করেন। হ্যাঁ, এমন ব্যক্তি, যে খেলাফতের ব্যবস্থাপনায় সর্বস্থানে ইমাম হবার যোগ্যতা রাখে তার ব্যাপার অন্য। নবী করীম (সাঃ) আরেকটি চিহ্ন বর্ণনা করেছেন যে, কারও বাসায় গেলে গৃহকর্তার আসনে যেন তার অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ না বসে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে ব্যাপারটি অতি গুরুতর। এরূপ স্থানেই মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত হয়। আর সেটাই হলো মানুষের জন্যে বিনয় প্রকাশের উত্তম স্থান। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন বিনয়ের পথ অনুসরণের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভ করি। আমীন।

## হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

# অমৃত বাণী

অনুবাদ : আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরবী

( গত সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর )

দুঃখের বিষয়, এসব লোক বুদ্ধি-প্রতিভা খাটিয়েও কোন কাজ করে না। আমি একজন চিররোগী মানুষ। সেই দু'টি হলুদ চাদর, যার সম্বন্ধে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেই দু'টি চাদরে মসীহ অবতীর্ণ হবেন, সেই দু'টি হলুদ চাদর আমাতে বিদ্যমান আছে। ইহার তা'বীর তা'বীরুররোইয়া শাস্ত্রে দু'টি রোগ বুঝায়। সুতরাং একটি চাদর আমার উপরের অংশে আছে, তা হলো মাথা ব্যথা, যা মাথা পাঁক, অল্প ঘুম এবং হৃদশূলের দরুন সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় চাদরটি রয়েছে আমার দেহের নীচের অংশে, ইহা দ্বারা বহুমূত্র রোগ বুঝায় যদ্বারা আমি দীর্ঘকাল হতে আক্রান্ত। অনেক সময় এক এক শ' বার রাতে বা দিনে প্রস্রাব করতে হয়। এত বেশী পরিমাণ প্রস্রাবের দরুন দুর্বলতার যত উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে ঐ সবই আমাতে রয়েছে। অনেক সময় আমার অবস্থা এমন হয় যে, নামাযের জন্য যখন আমি সিঁড়ি চড়ে উপরে যাই তখন আমার শারীরিক অবস্থা এমন হয় যে, আর আশা থাকে না, আমি সিঁড়ির এক ধাপের পর আর এক ধাপে পা রাখা পর্যন্ত জীবিত থাকবো কি না। এখন যে ব্যক্তির অবস্থা এরূপ যে, প্রতিদিন তাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়, এই প্রকারের রোগীদের প্রায়শঃ পরিণাম সম্পর্কে সকলেই অবহিত। অতএব এইরূপ বিপদ ও আশঙ্কা-জনক অবস্থার উপস্থিতিতে খোদার প্রতি সে কীরূপে মিথ্যারোপ করার দুঃসাহস করতে পারে এবং কোন স্বাস্থ্যের উপর ভরসা করে সে বলতে পারে যে, আমার বয়স আশি ( ৮০ ) বৎসর হবে? অথচ ডাক্তারী অভিজ্ঞতা তাকে মৃত্যুর মুষ্টির মধ্যে সদা আবদ্ধ বলে ঘোষণা করে। এইরূপ রোগাক্রান্ত মানুষ দীর্ঘ মেয়াদী জ্বরাক্রান্ত রোগীর ন্যায় লয় ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শীঘ্রই দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে নেয় অথবা কারবিকাল বা ক্যান্সার রোগে জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি যে এত বিপজ্জনক অবস্থার ভিতর দিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত তবলীগের কাজেও ব্যস্ত আছি, ইহা কি কোন মিথ্যা রচনাকারীর কাজ হতে পারে? যখন আমি আমার দেহের উপরের অংশে একটি রোগ এবং দেহের নীচের অংশে আর

একটি দ্বিতীয় রোগ দেখি তখন আমার অন্তর অনুভব করে যে, ইহা ঐ দু'টি চাদরই যার খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রদান করেছেন।

আমি কেবল আল্লাহ্‌র জন্য বিরুদ্ধচারী আলেম সমাজ ও তাদের সমধর্মাবলম্বী লোকগণকে বলছি যে, গালাগালি ও বদ জবানী করা ভদ্রতার নিয়ম নয়। যদি আপনাদের ইহাই অভ্যাস হয়ে থাকে তাহলে বেশ আপনাদের ইচ্ছা। কিন্তু যদি আপনারা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেন তাহলে ইহাও ইখতেয়ারে রয়েছে যে, সকলে মসজিদসমূহে সমবেত হয়ে অথবা পৃথক পৃথকভাবে আমার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেন, এবং কেঁদে কেঁদে আমার মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহর দরবারে কামনা পেশ করেন, অতঃপর যদি আমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তা হলে সেই সব দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করা হবে; আর আপনারা তো সব সময়ই দোয়া অবশ্য করে যাচ্ছেন; কিন্তু স্মরণ রাখবেন যে, যদি আপনারা এত পরিমাণ দোয়া করেন যে, জিহ্বাতে জখম পড়ে যায়, আর কাঁদতে কাঁদতে পর পর এত সেজদা করতে চলে যান যে, নাক ঘষে যায় এবং অশ্রুধারা এমনভাবে প্রবাহিত হতে থাকে যে, চোখের পুতলী গলে যায় ও পাতা ঝড়ে যায় এবং অধিক কাঁদাকাটির দরুন দৃষ্টি-শক্তি হ্রাস পায়, অবশেষে দিমাগ খালি ও হালকা হওয়াতে মৃগীর আক্রমণ আরম্ভ হয়ে যায় বা মালিখোলিয়া হয়ে যায় তথাপি সেই সব দোয়া গ্রহণ করা হবে না, কারণ আমি খোদার তরফ থেকে এসেছি। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে বদ দোয়া করবে সেই বদ দোয়া তার উপরই বর্তাবে। যে ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে বলে যে, তার উপর অভিশাপ হোক সেই অভিশাপ তার অন্তরের উপর পড়ছে কিন্তু তার কোন খবর নেই।

(সংকলিত: বিজ্ঞাপনসমূহ হযরত মসীহ মাওউদ তৃতীয় খণ্ড ৩৮৮ পৃ:)

---

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন:

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

لعنة الله على الكاذبين

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা)

লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন।

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত!

# হাকীকাতুল ওহী

[ মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ]
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ ( আঃ )

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

( ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর )

বলাবাহুল্য, نذير শব্দটি খোদাতা'লা ঐ মুরসালের জন্য ব্যবহার করেন, যাহার সমর্থনে ইহা নির্ধারিত হইয়া যায় যে, তাহার অস্বীকারকারীদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হইবে। কেননা, সতর্ককারীকে نذير বলা হয় এবং ঐ নবীকেই সতর্ককারী বলা হয়, যাহার সময়ে কোন আযাব হওয়া নির্ধারিত হইয়া যায়। আজ ২৬ ( ছাব্বিশ ) বৎসর পূর্বে বরাহীনে আহমদীয়ায় আমার নাম نذير রাখা হইয়াছে। অতএব উহাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে, আমার সময়ে আযাব অবতীর্ণ হইবে! এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগ ও ভূমিকম্পের আযাব অবতীর্ণ হইয়াছে। কোন কোন নির্বোধ বলে, ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ মানুষতো আপনার নামও জানে না। তবে তাহারা কেন ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতে মারা গেল? ইহার উত্তর এই যে, তাহারা তাহাদের পাপ ও দুষ্কর্মের আধিক্যের দরুন পৃথিবীতে তাহাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্য হইয়াছিল। অতএব খোদাতা'লা তাঁহার বিধান অনুযায়ী একজন নবীর আগমন পর্যন্ত ঐ আযাব মুলতবী রাখেন। যখন ঐ নবীকে প্রেরণ করা হইল এবং এই জাতিকে হাজার হাজার বিজ্ঞাপন ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হইল তখন তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধের শাস্তি দেওয়ার সময় আসিয়া গেল। এই কথা সম্পূর্ণরূপে ভুল যে, ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা আমার নাম সম্পর্কেও অনবহিত। এই ব্যাপারটি কোন ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট গোপন নাই যে, প্রায় বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে যখন আমি ইংরেজীতে ১৬,০০০ ( ষোল হাজার ) বিজ্ঞাপন ছাপিয়া এবং ইহাতে আমার দাবী ও যুক্তি-প্রমাণ এর বর্ণনা দিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় বিতরণ করিতে থাকি। ইহা ছাড়া কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইংরেজী পত্রিকা রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স প্রেরণ করা হইতেছে। ইউরোপের পত্র-পত্রিকাসমূহে বার বার আমার দাবীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং ডুই-এর * জন্য আমি যে বদ্‌দোয়া করিয়াছিলাম তাহাও ইউরোপের পত্র-পত্রিকসমূহে বর্ণনা করা হইয়াছিল। ২৪

---

* টীকা :— ইহা আমেরিকার এক মিথ্যাবাদী এবং ইলিয়াস নবী হওয়ার দাবীদারের নাম। সে আজকাল আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন অবস্থায় আছে।

( চব্বিশ ) বৎসরের অধিক সময় ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে এত প্রচার সত্ত্বেও কে এই কথা গ্রহণ করিবে যে, ঐ সকল লোক আমার নামও জানে না ? বরং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার সম্প্রদায়েও প্রবেশ করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সকলে জানে যে, হযরত নূহ ( আঃ )-এর তুফান ঐসকল লোককেও ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল, যাহারা হযরত নূহ ( আঃ )-এর নামও জানিত না। অতএব প্রকৃত কথা এই যে, যেমন আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ( সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত ১৬ ) খোদাতা'লা পৃথিবীতে আযাব অবতীর্ণ করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার পূর্বে কোন রসূল প্রেরণ না করেন। ইহাই আল্লাহ্ র বিধান। বলা বাহুল্য, ইউরোপ ও আমেরিকায় কোন রসূল আগমন করেন নাই। অতএব তাহাদের উপর যে আযাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা কেবল আমার দাবীর পরে হইয়াছে।

[অনিবার্য কারণে পুর পেণ্ডরীর অধিবাসী আবদুল কাদের-এর মূল লেখা ফটোকপি এখানে দেওয়া গেল না। পুস্তক ছাপাবার সময় দেওয়া হইবে সম্পাদক। ইনশাল্লাহ্]

(৬) ষষ্ঠ নিদর্শনটি হইল হাকিম হাফেয মোহাম্মদ দীনের মৃত্যু, যাহা মোবাহালার পর ঘটিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, এক ব্যক্তি নানাকর মৌজার অধিবাসী ছিল। ইহা কানা রেল ষ্টেশনের নিকটবর্তী এবং লাহোর তহসীলের অন্তর্গত। সে তাহার পুস্তকে আমার সম্পর্কে মোবাহালাস্বরূপ কয়েকটি কথা ব্যবহার করিয়াছিল এবং মিথ্যাবাদীর জন্য খোদাতা'লার গযব ও অভিসম্পাত-এর আবেদন করিয়াছিল। ঐ আবেদনের পর সে তাহার পুস্তকে আমার সম্পর্কে মোবাহালাস্বরূপ কয়েকটি কথা ব্যবহার করিয়াছিল এবং মিথ্যাদীর জন্য খোদাতা'লার গযব ও অভিসম্পাত এর আবেদন করিয়াছিল। ঐ আবেদনের পর সে তাহার পুস্তকের কয়েক জায়গায় ইহার উল্লেখ করিল। সে তাহার পুস্তকের নাম রাখিল 'ফয়সালা কোরআনী আওর তাকযীব কাদিয়ানী'। এই মোবাহালার এক বৎসর তিন মাস পরে সে মরিয়া গেল *

বস্তুতঃ সে ৭৬ পৃষ্ঠা, ৭৮ পৃষ্ঠা এবং ৮৫ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ মোবাহালাস্বরূপ লেখে :—

ويل لكل افاك اثيم ( সূরা—আল্ জাসিয়া আয়াত-৮ )। ( অর্থ :— প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য দুর্ভোগ—অনুবাদক )। ويل يومئذ للمكذبين ( সূরা আল্ মুত্তাফ্ফেফীন আয়াত-১১ )। ( অর্থ :—সেদিন সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের

* টীকা : তাহার এই পুস্তকটি হাকিম চনন দীনের ব্যবস্থাপনায় লাহোরের স্টিম প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল।

জন্য দুর্ভোগ—অনুবাদক)। لعنة الله على الكاذبين (সূরা আল্ ইমরান—আয়াত-৬২)। (অর্থ: মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত—অনুবাদক)। এই তিনটি আয়াত সে লিখিল। বস্তুত: একটি আয়াতে ঐ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করা হইয়াছে, যে মিথ্যা বলে এবং খোদার নামে মিথ্যা বানাইয়া বলে। অন্য আয়াতে ঐ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত করা হইয়াছে, যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে। অতএব ইহাই হইল মোবাহালা। তৃতীয় আয়াতে সাধারণভাবে মিথ্যাবাদীর উপর অভিসম্পাত করা হইয়াছে, যাহা আমি লিখিয়াছি। এই ব্যক্তি উক্ত পুস্তক প্রকাশের তিন মাস পরে মরিয়া গেল। এখন প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারেন যে, ইসলামে মোবাহালাকে একটি সিদ্ধান্তকারী বিষয়রূপে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। হাকিম হাফেয মোহাম্মদ দীন তাহার এই পুস্তকে আমাকে 'মুফতারী' (অর্থ:—আল্লাহর নামে যে মিথ্যা কথা বানাইয়া বলে) আখ্যায়িত করিল এবং افاك اثيم রাখিল। অতঃপর তাহার পুস্তকের ৬৩ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে এই আয়াত লিখিল—

ويل لكل افاك اثيم - يسمع ايت الله تتلى عليهم × ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها - فبشره بعذاب اليم -

অর্থাৎ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য অভিসম্পাত, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করে, অতঃপর সে অহংকার ভরে হঠকারিতা করে যেন সে উহা শ্রবণই করে নাই। অতএব তুমি তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। অতএব এই ব্যক্তি মোহাম্মদ দীন এই আয়াত লিখিয়া এই ইঙ্গিত করিতেছে যেন আমি افاك اثيم (অর্থাৎ ঘোর মিথ্যাবাদী) এবং তাহার জীবদ্দশাতেই আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবে নিপতিত হইয়া যাইব। কিন্তু খোদাতা'লা তাহার মৃত্যু দ্বারা ফয়সালা করিয়া দিলেন কে افاك اثيم

(৭) সপ্তম নিদর্শন: ১৯০৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর ভোরবেলায় এই ইলহাম হইল—"ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আসিল এবং আজ বৃষ্টিও হইবে। পুণ্যবান ব্যক্তি, তোমাকে স্বাগতম।" বস্তুত: এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে ভোরেই ইহা জামাতের সকলকেই শুনাইয়া দেওয়া হইল। যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনানো হইল তখন বৃষ্টির নাম নিশানা ছিল না, আকাশে বিন্দু পরিমাণ মেঘও ছিল না এবং সূর্য প্রচণ্ড কিরণ দিতেছিল। কেহ জানিত না যে, আজ বৃষ্টিও হইবে। ইহা ছাড়া বৃষ্টির পর ভূমিকম্পের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর যোহরের নামাযের পর একবার মেঘ আসিল এবং বৃষ্টি হইল এবং রাত্রিতেও কিছু বর্ষণ হইল। ঐ রাত্রিতে ভূমিকম্প আসিল, যাহার সকাল ছিল ১৯০৭ সালের ৩রা

× টীকা: এই ব্যক্তি কুরআন না জানার দরুন কুরআনী আয়াতের এই শব্দটি ভুল লিখিয়াছে। সঠিক আয়াতটি এইরূপ- يسمع ايت الله تتلى عليه

মার্চ তারিখ। সাধারণভাবে ইহার সংবাদ আমার নিকট পৌঁছিয়া গেল। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণীর উভয় দিক তিন দিনে পূর্ণ হইয়া গেল।

এই লেখার পর ১৯০৭ সালের ৫ই মার্চের ডাকে আমার নিকট দুইটি চিঠি আসিল। একটি চিঠি ছিল কালানূরের জমিদার ভ্রাতা মির্যা নিয়ায বেগ সাহেবের নিকট হইতে। এই চিঠিতে লেখা ছিল যে, দোসরা ও তেসরা মার্চের মধ্যবর্তী রাত্রিতে ভূমিকম্পের ভয়ানক ঝাঁকুনী অনুভূত হইয়াছে। ইহার পূর্বে বৃষ্টিও হইয়াছে এবং শিলাপাতও হইয়াছে। "আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে" ইলহামটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই ডাকেই গুজরাতের তহসিলদার ভ্রাতা মিঞা নবাব সাহেবের নিকট হইতে আমি একটি পোষ্ট কার্ডের চিঠি পাইলাম। ইহাতে লেখা ছিল যে, ১৯০৭ সালের দোসরা ও তেসরা মার্চের মধ্যবর্তী রাত্রির সাড়ে নয়টায় ভূমিকম্পের একটি ভয়ানক ঝাঁকুনী অনুভূত হইয়াছে এবং ইহা খুব বিপজ্জনক ছিল।

১৯০৭ সালের ৫ই মার্চের লাহোরস্থ সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট পত্রিকা লেখে যে, শ্রীনগরে (কাশ্মীর) শনিবার রাত্রি সাড়ে ৯ টায় একটি তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছে। ইহা উত্তর পূর্ব দিকে কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী ছিল।

কেহ কি আমাকে বলিবে যে, নিজের তরফ হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করার শক্তি কি কোন মানুষের আছে যে আজ বৃষ্টি হইবে এবং ইহার পরে ভূমিকম্প আসিবে। এইরূপ সময়ে সংবাদ দেওয়া হইল যখন রৌদ্র ছিল এবং বৃষ্টির কোন লক্ষণ ছিল না। এইভাবেই ঘটনা ঘটিল। যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, ইহার প্রমাণ কি? তাই সম্মানিত চাক্ষুষ সাক্ষীগণের নাম নিম্নে লেখা হইল, যাহাদিগকে এই ভবিষ্যৎবাণী ঐ সময়ে শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৯০৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভোর বেলায়, যখন পরিষ্কার রৌদ্র ছিল, আকাশে সূর্য চমকাইতে ছিল এবং মেঘের নাম নিশানা ছিল না। (ক্রমশঃ)

---

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

# জুমুআর খুতবা

## সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ )

[ ৮ই আগষ্ট '৯৭ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত ]

অনুবাদ : আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,
সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর ( আইঃ ) সূরা ইউনুসের ৭২ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :

واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه ياقوم ان كان كبر عليكم مقامى و تذكيرى بايت الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم و شركاءكم ثم لايكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الى و لا تنظرون ○

হুযুর আকদস সর্বপ্রথম আয়াতটির অনুবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, তুমি তাদিগকে নূহের বৃত্তান্ত শুনাও, যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, হে আমার জাতি ! যদি তোমাদের উপর আমার মান-মর্যাদা বোঝা মনে হয়। এবং তোমাদের জন্য ইহা ভারি হয়ে থাকি, এবং و تذكيرى بايات الله আল্লাহ্তা'লার আয়াতসমূহ ( নিদর্শনাবলী ) দ্বারা তোমাদেরকে আমার উপদেশ দেয়া তোমাদের পক্ষে কঠিন বিষয় হয়ে থাকে فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم —তাহলে তোমরা স্মরণ রেখো যে, তোমাদের যে উত্তরই হউক না কেন ইতিবাচক হউক বা নেতিবাচক, আমি উহার কোন পরোয়া করি না, কারণ على الله توكلت আমার সকল চেষ্টা সাধনা কেবল আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল। فاجمعوا امركم وشركائكم সুতরাং তোমারা নিজেদের সকল বিষয়-বস্তুকে এবং সকল শক্তি-সামর্থ্যকে একত্রে জড়ো করে ফেলো ; امر এর অর্থ বিষয়াবলীও হয় এবং امر দ্বারা শক্তি-সামর্থ্যও বুঝায় ; সুতরাং এই সব অর্থের মর্ম এই দাঁড়াবে যে, তোমরা তোমাদের সকল প্রকারের শক্তি-সামর্থ্য জড়ো করো। وشركائكم এবং তোমাদের শরীকানকেও ডেকে নাও। ثم لايكن امركم عليكم غمة যার পর তোমাদের দৃষ্টিতে তোমাদের বিষয়টি যেন কোন দিক দিয়ে সন্দেহজনক ও দ্ব্যর্থ-বোধক না থাকে, তোমাদের এইরূপ সংশয় যেন না থাকে যে, এই শক্তিও আমাদের কাছে ছিল, ওরাও আমাদের শরীকান ছিল এবং আমাদের সাহায্যের জন্য আসতে পারতো। অতএব সকলকে ডেকে নাও, এমন কি দূর সম্পর্কেরও কোন প্রকারের সম্ভাবনা যেন

অবশিষ্ট না থাকে যা তোমাদের আয়ত্তে ছিল কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ কর নি; অতএব সব কিছুই এখন করে ফেলো। ثُمَّ اقْضُوا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ—"অতপর যাকিছু সিদ্ধান্ত তোমরা আমার সম্বন্ধে গ্রহণ করতে চাও তা তোমরা করে ফেলো এবং আমাকে কোন প্রকার অব্যাহতি দিও না।" এই কথাগুলি আল্লাহ্‌তা'লা হযরত নূহ আলায়হেস সালামকে বললেন যে, তুমি ঘোষণা করে দাও, এখন সময় এমন এসে গেছে, বিধাতার বিধানে এই ফয়সালা করে নেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের সকল শক্তি-সামর্থ্য একত্রে সমবেত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সব নিশ্চিত ব্যর্থ ও নিষ্ফল হবে এবং তোমরা আমাদের আদৌ কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এই চ্যালেঞ্জ আল্লাহ্‌র এক এমন নবীর চ্যালেঞ্জ ছিল যে একা নিঃসঙ্গ ছিলেন। তার পার্শ্বে কতক এমন লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল যাদিগকে জাতি অতি তুচ্ছ ও হীন লোক বলে দেখতো; যাদিগকে তারা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ বলে জ্ঞান করতো, যেরূপভাবে পাঞ্জাবে প্রচলিত ভুল প্রথা অনুযায়ী শ্রমজীবীদের এক শ্রেণীকে নিম্ন মানের মানুষ গণ্য করা হয়; এই প্রকারেরই কিছু সংখ্যক লোক হযরত নূহ আলায়হেস সালামের চতুষ্পার্শে জড়ো হয়ে গিয়েছিল, গোটা জাতি তাদিগকে প্রত্যাখ্যান ও ধিক্কার করলো এবং হাসি-ঠাট্টার শিকার বানালো যে, দেখো! এই প্রকারের লোক!! যারা নূহের চতুষ্পার্শে জড়ো হয়েছে। এই তো ছিল অবস্থা, আর দাবী ছিল বড় বড় আকাশচুম্বী। চ্যালেঞ্জটি ছিল এমন আযীমুশ্‌-শান যে, মানুষকে ইহা কম্পমান করে তুলে। এক দুর্বল, নিরুপায় ও নিঃস্ব ব্যক্তি কাঠ জড়ো করছে, ঐগুলিতে পেরেক ঠুকছে আর দাবী এই করছে যে, তোমরা সকলে সমবেত হও এবং যা কিছু করবার আছে করে ফেলো। প্রকাশ থাকে যে এই রূপ ঘোষণা হযরত নূহ আলায়হেস সালামের নৌকার কাজ সম্পূর্ণ করার এবং উহাতে আরোহী হওয়ার পূর্বেকার ঘোষণা; তিনি নৌকায় আরোহণ করে জাতিকে এই আওয়াজ দেন নি যে, এখন তোমরা সকলে মিলে যা ইচ্ছা করতে পার। হযরত নূহ আলায়হেস সালাম জাতির সঙ্গে বসে আলাপকালে এই ঘোষণা করছিলেন যে, তোমরা যা করতে পার কর।

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতও ঠিক সেই অবস্থাতে অবস্থান করছে যা হযরত নূহ আলায়হেস সালামের উপর এক সময় এসেছিল। হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামকে যে কিশতিয়ে নূহ বানানোর আদেশ ছিল উহার এই উদ্দেশ্যেই ছিল। কিশতিয়ে নূহ নির্মাণকারী এই ঘোষণা করেছিলেন যে, তোমরা যাকিছু সমবেত করতে চাও তা করে ফেলো, নাক রগড়ে নাও কপাল ঘষে ঘষে ক্ষয় করে ফেলো, কাঁদতে কাঁদতে চোখের পাতা-পুতলী গলিয়ে ফেলো; কিন্তু স্মরণ রেখো যে, তোমরা যা কিছুই করতে পার তা কর তথাপি তোমরা আমার পশমও নড়াতে পারবে না এবং ঘুণাক্ষরেও কোন ক্ষয়-ক্ষতি করতে পারবে না; আমি অবশ্যই বৃদ্ধি লাভ করবো; বিস্তৃত

হবো এমন কি বিভিন্ন জাতি আমার মাধ্যমে বরকত ও আশীষমণ্ডিত হবে। এই ছিল হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের প্রকাশ্য ঘোষণা। এই ঘোষণাকে হযরত নূহ আলায়হেস সালামের ঘোষণার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, হুবহু সেই অবস্থাই লক্ষ্য করবেন। এই জন্যই হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামকে কিশ্‌তি নির্মাণের আদেশ প্রদান করা হয়েছিল। প্রশ্ন, সেই কিশ্‌তি কী ছিল? এই সম্পর্কে আমি পূর্বেও কিছু বক্তব্য রেখেছি; কিছু এখনো রাখবো এবং কিছু ভবিষ্যতেও ইহার আলোচনা হতে থাকবে। কিন্তু এখন সময় এসে গেছে যেন আমরা সকলেই নৌকায় আরোহণ করি, সেই নৌকায় আরোহণ করি যা হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম নির্মাণ করেছেন, যে নৌকার সম্বন্ধে হিফাযতের ওয়াদা রয়েছে। আপনারা যদি এই নৌকায় আরোহণ করেন তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাদের অনু পরিমাণও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তারা আপনাদের সামনে দেখতে দেখতে একের পর এক ডুবতে চলে যাবে। ইহা সেই তকদীর (অবধারিত বিষয়) যাহাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা দুনিয়ার কারো কাছে নেই; ইহা সেই তকদীর যাকে লক্ষ্য রেখে আমি মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম; ইহার ফলে এ বৎসর আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে জামাত অনেক অনেক গৌরবোজ্বল সফলতা অর্জন করেছে; সেগুলি আপনারা নিজ চোখে সালানা জলসায় প্রত্যক্ষ করবেন, কিছু নিজ কানে শ্রবণ করবেন, কিছু আরো আছে যেগুলির বৎসরব্যাপী উল্লেখ হতে থাকবে। এই সব সফলতার তুলনায় শত্রুর ভাগ্যে এমন লাঞ্ছনা, অপমান ও অপদস্থতা জুটেছে যা বর্ণনা করা যায় না। তারা এমনভাবে নিরুপায় ও অসহায় হয়ে পড়েছে যে, এইসব উল্লেখ করতে গিয়ে তাদের প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে। আবোল তাবোল বলে উল্টা পাল্টা বিবরণ দিচ্ছে। পত্রিকা গুলি উঠিয়ে দেখুন, পত্রিকার কতক পৃষ্ঠা তাদের মুখ ও দাঁড়িতে কালো বলে দৃশ্যমান হবে, কারো কারো মাথায় নানা প্রকারের চাদর পরিহিত দেখা যাবে, কারো কারো মাথায় উঁচু টুপী পরিলক্ষিত হবে; কিন্তু কদাচিৎই কেউ হবে যে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করে; কার কী ঠেকা পড়েছে যে সে গভীর দৃষ্টিতে তাদিগকে দেখবে, তাদিগকে খুঁজে বের করবে যে, কে কোন মৌলবী, যার চেহারা সে দেখবে? তাদের বড় বড় মন্তব্য আপনারা পড়বেন, তাদিগকে উচ্চ কণ্ঠে আকাশচুম্বী বুলি আওড়াতে শুনবেন যে, আমরা আহমদীয়তকে পরাস্ত করেছি; কীরূপে পরাস্ত করেছো? কোথায় পরাস্ত করেছো? পরাস্ত করার কিছু চিহ্ন তো পেশ করে দেখাও, দুনিয়ার কোন দেশে তোমরা এইরূপ ঘটনা ঘটিয়েছো? আপনারা আপনাদের পূর্ণ দৃষ্টি গোটা জগতে ঘুরিয়ে নেন; আপনারা দেখতে পাবেন যে, খোদাতা'লার ফযলে আহমদীয়ত সফলতার পর সফলতার সহিত প্রত্যেক স্থানে যাত্রাপথ দ্রুত বেগে অতিক্রম করে যাচ্ছে। প্রত্যেক বিজয়ের পর আর একটি বিজয় তার ভাগ্যে জুটে যাচ্ছে।

কিন্তু এই লোকগুলি বুক চাপড়ে যাচ্ছে, আর মুখে এই বুলি আওড়িয়ে যাচ্ছে, যে, "আমরা হারিয়ে দিয়েছি, আমরা হারিয়ে দিয়েছি।" আজব অবস্থা যে, মার খাচ্ছো তোমরা, হুশ-জ্ঞান হারাচ্ছো তোমরা। কথা বলার আদব-তমীয তোমরা ভুলেছো; না দর্শন জ্ঞান আছে, তোমাদের কাছে না যুক্তি প্রমাণ। কখনো এদিকে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছো, আর কখনো ঐ দিকে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছো। মোট কথা, তোমাদের যে অবস্থা দৈনন্দিন প্রকাশ পাচ্ছে, ঐগুলির সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলতে লজ্জা বাধা দেয়—কিন্তু তথাপি মুখে তোমরা বলে যাচ্ছো, আমরা আহমদীয়তকে পরাস্ত করেছি, শিক্ষণীয়ভাবে পরাস্ত করেছি। সব দুনিয়া থেকে ইহার পা উৎপাটিত করে দিয়েছি। কারো জানা নেই যে, উৎপাটন কাকে বলে? এই সব বিষয়ের যতটুকু প্রশ্ন! আপনারা দিনের পর দিন দেখতে চলে যাবেন যে, তারা সর্বদা অকৃতকার্যতা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েই চলে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তির পদ্ধতিও ভিন্ন, তাদের স্বীকারোক্তির মধ্যেও অস্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকে। তাদের মুখ হতে কখনো কোন কথা বের হয়ে যায়, আবার কখনো ইহার বিপরীত অন্য কথা বের হয়ে যায়। কিন্তু শত পেঁচাপেঁচির পরও তারা অবশেষে মানতে বাধ্য।

এখন মঞ্জুর চিনিউটিকে ধরেন সে এখানে এবারের জলসায় এক উপলক্ষে ঘোষণা করলো যে, "আমি যখন এদেরকে পাকিস্তান থেকে বের করেছিলাম তখন এদের অবস্থা কী ছিল। এরা এখন সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে।" চিন্তা করুন! স্বীকারোক্তিরও অনেক পদ্ধতি আছে, "এরা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে" এখন আমাকে তোমরা টাকা দাও, যাতে আমি তাদের মোকাবেলা ও চিকিৎসা করতে পারি—টাকা দাও—যেরূপে পূর্বে টাকা নষ্ট হয়েছে, তোমাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে; লোকের কবরস্থান খরীদ করেছো তাদের উপর চড়াও করেছো; বাকি টাকা দিয়ে তোমাদের কী হবে—এরূপই হবে! কিন্তু মনে রেখো, সারা দুনিয়ার শক্তিগুলিও যদি তোমাদেরকে টাকা দেয়, তথাপি তোমরা আমাদের চুল পরিমাণও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, অসম্ভব। তোমাদের উপরই লাঞ্ছনার মার পড়তে থাকবে, ইহা তকদীরের লিখন তোমরা কস্মিন কালেও বদলাতে পারবে না। ইহা আমি কথা প্রসংগে বললাম; নচেৎ এই অভিশপ্ত ও অলক্ষ্মী ব্যক্তিটির তো নাম উচ্চারণ করতেও আমার ঘৃণা হয়। যদি আমি তার নামও উচ্চারণ করি, সে গৌরব করে বলতে থাকে যে দেখ! আমার নাম উচ্চারণ করা হচ্ছে; সে এই ঘোষণা করে বেড়ায় যে দেখ! আমার মর্যাদা কত উঁচু!! মির্যা তাহের আহমদ আমার নাম উচ্চারণ করছে। আজব বোকার হাড়ি এই ব্যক্তি, লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতীক মাত্র, তার মধ্যে লজ্জা শরম লেশ মাত্রও নেই, কোন কথা ও কোন বিষয়ে তার লজ্জা শরম নেই। বার বার তাকে বলা ও বুঝানো হয়েছে যে, তোমাকে তো মরে যাওয়া উচিত ছিল, ফাঁসী কাষ্টে ঝুলা উচিত ছিল:

তবে তুমি তোমার অঙ্গীকার অনুযায়ী ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলন্ত আছো। এখন কথা বাড়াচ্ছো।

যাইহোক এই বিষয়টি এমন নহে যে, ইহার অপবিত্র-ঘৃণ্য উল্লেখ লম্বা করা যেতে পারে, যা কিছু বলার ছিল ইঙ্গিতে বলে দিয়েছি। আমি আপনাদিগকে বুঝাতে চাই যে, কৃতকার্যতা ও সফলতার দেশের প্রতি সর্বদাই হিংস-বিদ্বেষ পোষণ করা হয়। সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে মোমেনদিগকে আল্লাহতা'লা যে উপদেশ দান করেছেন উহা এই দোয়ার মধ্যে শিখিয়েছেন, ومن شر حاسد اذا حسد

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'লার নিকট হিংসুকের অনিষ্ট হতে তখন আশ্রয় কামনা কর যখন সে হিংসা করে! আমি একবার কুরআনের দরসে এ কথাটির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছিলাম যে, এই আয়াতে আযীমুশ্ শান ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা বারংবার এমন অনেক সুযোগ লাভ করবে যখন শত্রুর জন্য হিংসা করার অনেক কারণ সৃষ্টি হবে। হিংসা এমন বিষয় যা সব সময়ই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু হিংসুক যখন হিংসা করে তখন সে সর্বদাই বড় সফলতা দেখেই হিংসা করে। এই হিংসার প্রকাশ কোন সময় এক ধর্মের আকারে কোন সময় শহরের আকারে সর্বদাই সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে থাকে। এইজন্য কুরআন এই তাৎপর্য গভীর বিষয়-বস্তুকে এইভাবে বর্ণনা করেছে যে

ومن شر حاسد اذا حسد নচেৎ যদি ইহা মানুষের কালাম হতো তা হলে ومن شر حاسد পর্যন্তই কথা শেষ করা হতো যে, হিংসুকের অনিষ্ট হতে রক্ষা কর। اذا حسد শব্দগুলি স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, হিংসুকের জন্য এমন কারণসমূহ সৃষ্টি হবে যে, তার গায়ে আগুন লেগে যাবে, অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে পড়বে সে, যে কীরূপে নিজের লাঞ্ছনা গঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং কীরূপে তোমাদের বিজয়কে পরাজয়ে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এটাই সেই সময় যখন বিশেষভাবে আপনাদিগকে আল্লাহ্ র আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, এবং ومن شر حسد اذا حسد দোয়াটি বুঝে শুনে পড়া উচিত।

বর্তমানে পৃথিবীতে এইরূপই হচ্ছে, সর্বত্র বড় বড় শক্তিগুলিও যাদের মধ্যে পাকিস্তানও অন্তর্ভুক্ত, এই ব্যাধিতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। সৌদী আরবে রীতিমত একটি সেল প্রতিষ্ঠিত আছে যার নামকরণ করেছে তারা রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ইহার প্রধান নায়ক এমন এক ব্যক্তি যে হিংসারই ফসল, যে (নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম মুসলমান বৈজ্ঞানিক) ডক্টর আবদুস সালাম সাহেবের সঙ্গে সারাটা জীবন তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে হিংসা পোষণ করে গেলো। এখনো হিংসার আগুনে সে জ্বলছে, কিছুই করতে পারে না। সে সেই রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর প্রধান নায়ক সেজে বসে আছে; কুয়েতে তার অফিস, সেখানেই দুনিয়ার বড় বড় শক্তির প্রতিনিধিগণ বসে আছে; তাদের কানে সে এমন

মৃদুস্বরে আওয়াজ ফুৎকার করতে থাকে যা তাদিগকে দুষ্টামিতে আরো উত্তেজিত করে তুলে। আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না; কিন্তু আমরা প্রতি মুহূর্তে খবর পাচ্ছি যে, কীরূপে তারা নানাবিধ কলা-কৌশল ও চাতুর্য অবলম্বন করে? কীরূপে তারা সমবেত হয়? কোথা থেকে রাষ্ট্রদূতগণকে পরিবর্তন করে সেখানে আনা হয় এবং তাদিগকে কী কী উপদেশ দেওয়া হয়, মোট কথা, এসব দুষ্টামির জন্য বর্তমানে অনেক বেশী চেষ্টা-তদবীর চলছে। আফ্রিকা তো তাদের গায়ে আগুনই লাগিয়ে দিয়েছে; আমি আশা করি আফ্রিকা তাদিগকে আরো অধিক আগুনে জ্বালাতে থাকবে; কারণ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আফ্রিকান মাথা অনেক অনেক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে, আফ্রিকান মাথায় ন্যায়-বিচার পাওয়া যায়। আমি বহু বার আমার বক্তৃতায় বলেছি যে, আফ্রিকানদের মধ্যে যদিও বাহ্যিকভাবে দোষ-ত্রুটি দেখা যায় কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে কোন গভীর দোষ-ত্রুটি নেই। এই ব্যাপারে যদি আমি বিস্তারিত বিশ্লেষণ করি, খুব সম্ভব পূর্বেও করেছি, তাহলে আপনারা স্বীকার করবেন যে, আসলে তাদের চামড়া অবশ্য কালো কিন্তু অন্তর তাদের সাদা, আফ্রিকানদের অন্তর উজ্জল, তাদের মন-মেযাজ পরিষ্কার। তাই তো যখনই আহমদীয়তের বিরুদ্ধে ওখানে ষড়যন্ত্র হয়েছে তখনই আফ্রিকান লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং তারা কঠোর-ভাবে ঐগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঘানার কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি যে, সেখানে বহুবার শত্রু চেষ্টা করেছে। এইভাবেই একবার রাবেতায়ে আলম ইসলামীর উদ্যোগে মিশরে মিটিং ডাকা হলো এবং আফ্রিকানদের মধ্যে বিশেষ করে ঘানাকে উত্তেজিত করা হলো যেন তারা আহমদীয়তের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়; কিন্তু ঘানা ইহাতে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে ইহাকে পায়ের জুতার দামও দেয় নি।

আফ্রিকানদের একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে, আর ইহা হলো এই যে, যদি যুক্তি ও দর্শনজ্ঞানে কথা বলা হয়, তারা সহজে বুঝে ফেলে এবং মনে করে যে, ধর্মের ব্যাপারটি খোদার সঙ্গে; আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস এই কেন্দ্র বিন্দুর চতুষ্পার্শে গঠিত ও রচিত হয়েছে। গোটা আফ্রিকার ইতিহাসে আপনি ধর্মের ক্ষেত্রে এই বুনিয়াদী বিষয়টি কার্যকরী বলে লক্ষ্য করবেন যে, একই গৃহে আস্তিকও বসবাস করছে, নাস্তিকও বসবাস করছে। এবং বেদীনও থাকছে, যাকে বিভিন্ন নামে আখ্যা দেয়া হয়েছে; কিন্তু আসলে তারা বুত পরস্ত নয়, এবং সকলের জন্য বুতপরস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়; নাস্তিক, বেখোদা, বেদীন সব প্রকারের লোকই ইহার অন্তর্গত, যাদিগকে Pagan বলা হয়; ইহুদী মুসলমান একই গৃহে বসবাস করছে; কারো এক আত্মীয় কোন এক ধর্মের অনুসারী একই গৃহে তারা সকলেই বাস করছে। ধর্মের নামে বিশেষ করে ঘানাতে কোন বিশৃঙ্খলা সহ্য কর হয় না, যদি বিশৃঙ্খলা হয়েও থাকে, তা উত্তরাঞ্চলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকাংশ

বিশৃঙ্খলা মুসলমানকে মুসলমানের সঙ্গে লড়ানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট কথা আমি আপনাদিগকে সংক্ষিপ্তভাবে আফ্রিকার মেযাজ সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এখানে ঘানায় ধর্মের নামে যদি বিশৃংঙ্খলা এসে থাকে, তা উত্তরাঞ্চল থেকে নীচে নেমেছে যেখানে কিছু সংখ্যক বিকৃত মুসলমান আলেম ধর্মে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করে এবং নিজ থেকে তারা খোদার স্থান দখল করে বসে। গোটা আফ্রিকায় যেখানেই ধর্মের নামে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, তা উত্তর থেকে মরু ভূমিতে নেমেছে, অর্থাৎ আফ্রিকার স্বয়ং আপন মেযাজ এইরূপ নয়। আফ্রিকা এ বিষয়ে গৌরব বোধ করে যে, আমরা ধর্মের বিষয়কে খোদার উপর ন্যস্ত করি, আর সামরিক বিষয়াবলীকে নিজের হাতে বহন করি। এই কারণেই পূর্ণ ইতিহাসে অর্থাৎ আফ্রিকায় আহমদীয়তের যা ইতিহাস রচিত হয়েছে উহাতে একটি কথা স্পষ্ট, যা সেখানকার নেতৃবর্গও এবং বুদ্ধিজীবীগণও জোর কণ্ঠে বলেছেন এবং স্বীকার করেছেন। তারা বারংবার বলেছেন যে, আহমদীয়া জামা'ত ধর্মের নামে কখনো বিভেদ সৃষ্টি করে না। তারা বারংবার স্বীকার করেছে যে, আহমদীয়া জামা'ত না ধর্মের নামে অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক কোন কাজ করে, না এই জামা'ত রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে এবং রাজনীতিকে নিজেদের ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। ইহা এমন এক জামা'ত যারা দেশ ও জাতির কেবল সেবা করে। যেখানে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করেছে সেখানেও তারা রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে না এবং সেখানেও তারা ঐ সকল জাতির সঙ্গে সদাচরণ বলবৎ রাখে যারা ধীরে ধীরে সংখ্যা লঘিষ্ঠে পরিণত হচ্ছে। এই হলো জামা'তে আহমদীয়ার ভূমিকা যা তারা আফ্রিকায় পালন করে যাচ্ছে। আফ্রিকা ইহাকে স্বীকৃতি দান করেছে সকল সরকারী কর্তৃবর্গ ইহার সম্মান করে এবং আহমদীগণকে তারা সর্বদা সম্মান ও মাহাত্ম্য এবং গাম্ভীর্যের দৃষ্টিতে দেখে ; কেননা, ইহারা আফ্রিকায় কার্যকরী গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে এবং নিজেদের ধর্মকে কখনো বিশৃংঙ্খলা এবং অপরের অধিকার খর্ব করার জন্য ব্যবহার করেনি।

সুতরাং প্রত্যেকটি আহমদী, যখনই উত্তম আহমদী হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে, অন্যদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে গেছে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে খৃষ্টান জাতিরও সেবা করেছে, Pagan জাতিরও সেবা করেছে। সর্ব স্তরের সকলের সঙ্গে সমব্যবহার করে গেছে।

এই সেই দেশ, যেখানে এখন শত্রু ষড়যন্ত্র করছে যেন ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই ষড়যন্ত্র পাকিস্তানে জন্ম নিয়েছে এবং সেখানে লালিত পালিত হয়েছে এবং কুয়েতে এসে রাবেতা আলমেই ইসলামীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। পূর্ণরূপে শক্তি খরচ করছে যেরূপে পূর্বেও শক্তি খরচ করেছিল। এখন তাদের এই ষড়-

যন্ত্রের লক্ষস্থল হলো আফ্রিকা মহাদেশ। প্রথমে ইহার কোন অংশকে ছিনিয়ে নিয়ে পাকিস্তানী কায়দায় সেখানে ধর্মের নামে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। অতঃপর সেখান থেকে ইহার বীজ আফ্রিকার অপরাপর অঞ্চলে রপ্তানী করা।

এই সেই ষড়যন্ত্র, যার সম্বন্ধে আমি জামাতকে অবহিত ও সাবধান করতে চাই যে, কুরআন করীমে এমনই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌তা'লা এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন ومن شر حاسد اذا حسد যে যখনই হিংসুক হিংসা করবে তখন আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করবে। প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, আমাদের আশ্রয় মাত্র একটিই, আর ইহা হলো আল্লাহ্‌র আশ্রয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, বুঝে শুনে উপলব্ধি করে খোদার আশ্রয়ে আসার মধ্যে তাৎপর্য আছে। খোদার আশ্রয় তো সকলেই চায়। যখন কোন বিপদ আপতিত হয়, যখন নৌকাসমূহ নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন মানুষ বলে, আমি খোদার আশ্রয় চাই; এমন কি নাস্তিকও খোদার আশ্রয় গ্রহণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু সে আশ্রয় পেলেও উহা তার উপকার সাধন করে না। এস্থলে যে খোদার আশ্রয়ে আসার সম্পর্ক রয়েছে উহা এই যে, যেসব বিষয়ের দরুন হিংসার উদ্রেক হয় ঐগুলি নেয়ামতস্বরূপ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হয় ঐগুলি নেয়ামতের সঙ্গে বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সম্পৃক্ত আছে, হিংসা-বিদ্বেষ সম্পৃক্ত আছে। অতএব আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করছেন যে, আমি তোমাদের উপর যে সব নেয়ামত নাযিল করবো তাতে তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হতে থাকবে, এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় তোমরা উন্নতি করতে থাকবে। সেই সময় যদি শত্রু তোমাদিগকে বিরক্ত ও বিষন্ন করে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করে তখন বিরক্ত ও বিষন্ন হইও না এবং এইরূপ মনে করিও না যে, আল্লাহ্‌তা'লা যে নেয়ামত দান করেছেন উহার সঙ্গে এক বিপদও এসে গেল। আল্লাহ্‌তা'লা ইরশাদ করছেন, তোমরা খোদার আশ্রয়ে চলে এসো এবং এই সব নেয়ামতের হিফাযত খোদার নিকট চাও, যিনি নিয়ামত দান করেছেন, তিনি জানেন যে, এসব নেয়ামতের হিফাযত কীরূপে করতে হয়। (ক্রমশঃ)

---

(২৫ পাতার পর)

পৃথিবীটা ভীষণ অসুস্থ,
দিন-রাত্রি রাত্রি-দিন
ধুঁকছে কেবল
দুর্বিষহ যন্ত্রণায়.....
কোন কমবায়োটিকে, কোন্ সে নিদানে
নিরাময় হবে এমন ক্ষত?
কোন্ সনেরিনে, ভ্যালিয়ামে
একটু শান্তি পাবে!!

(রেডিও বাংলাদেশ থেকে প্রচারিত)
(২-৩-৭৯ তারিখের দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে)

সূচনায় আলোচনা দীর্ঘায়িত করছিনা। ইনশাল্লাহ ক্রমাগত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রোগের কথা বলবো ও ঐশী-প্রদত্ত প্রতিবিধানের সন্ধান দিবো। আল্লাহ্ আমাদের সবার সহায় হউন। আমীন।

# হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর খোদা-প্রেম ও তাঁর ইবাদত

মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আমি ইনসান ও জীনকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। ইবাদতের প্রাণ হলো খোদার প্রেম, খোদার প্রেমে যদি হৃদয় উদ্বেলিত না হয় তাহলে ইবাদতের স্বাদ অনুধাবন করা যায় না। পৃথিবীতে যিনি তাঁর হৃদয় উজাড় করে খোদাকে ভালোবেসে তাঁর ইবাদতে নিজ সত্তাকে হারিয়ে মানবজাতির জন্যে আদর্শ হয়েছেন সেই মহামানব হলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যার (সাঃ) জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসে খোদার স্মরণ ও ভালোবাসা ছিল অবিচ্ছেদ অংশ। এ জন্যে তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য পাথেয় তাঁর জীবনের যে কোন দিক নিয়ে আলোকরতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এখানে সে অবকাশ নেই। তাই সংক্ষেপে তাঁর (সাঃ) পবিত্র সীরাতের কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাঁর গোটা জীবন খোদার প্রেমে বিভোর হয়ে কাটিয়েছেন। ইসলামের প্রচার, মুসলমানদের তরবীয়ত ও প্রশাসনের মত গুরু-দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে দিন রাত আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। নিশীথ রাতে ইবাদতে দাঁড়াতেন তো সকাল হয়ে যেতো। এমন কি অনেক সময়ে সারা রাত ধরে ইবাদত করার কারণে পা ফুলে যেতো আর যারা সে দৃশ্য দেখতো তাদের হৃদয়ে তাঁর জন্যে বেদনার সৃষ্টি হতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) এমনই এক অবস্থায় আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্ র রসূল! আপনি তো খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত তবুও কেন নিজেকে এত কষ্ট দেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) উত্তর দিলেন, হে আয়েশা! আফালা আবদান শাকুরা (আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?) অর্থাৎ যখন এ কথা সত্য যে, আমি খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত। খোদাতা'লা নিজ ফযলে আমাকে তাঁর নৈকট্য প্রদান করেছেন। তখন আমার কর্তব্য এই নয় কি যে আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি?

বদরে যুদ্ধের পূর্বের মূহূর্তে আল্লাহ্ র রসূল (সাঃ) সেজদায় পড়ে আছেন। এমন ব্যাকুলভাবে খোদার নিকট কান্নাকাটি করছেন যে, পাশে দণ্ডায়মান হযরত আবুবকর (রাঃ) এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলেন না, তাই বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্ র রসূল! ক্ষান্ত হন। আর কত কাঁদবেন। আল্লাহ্ তো বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েই দিয়েছেন। পরে উত্তর দিলেন, হে আবু

বকর ! এর মধ্যে কোন সুপ্ত শর্ত থাকতে পারে। (অর্থাৎ আরো দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে)

তিনি (সাঃ) কোন পদক্ষেপ খোদার নির্দেশ ব্যতিরেকে গ্রহণ করতেন না। মক্কায় চরমভাবে নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও খোদাতা'লার হুকুম ছাড়া মক্কা হতে হিজরত করেন নি। মক্কাবাসীর অসহনীয় নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবীগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি পেলেন। এ সময় সাহাবীগণ মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, নবী করীম (সাঃ)ও যেন তাদের সাথে চলেন। এর উত্তরে প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, আমি এখনও খোদাতা'লার পক্ষ হতে অনুমতি পাই নি।

আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম শুনতেন তো চোখ হতে অশ্রু ঝড়তে শুরু হতো। বিশেষভাবে ঐ সকল আয়াতসমূহ যেগুলোতে তাঁর দায়িত্বাবলী সম্বন্ধে বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা হুযুর (সাঃ) বললেন, আমাকে কুরআন পাঠ করে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! কুরআন তো আপনার উপর নাযেল হয়েছে। আপনাকে কি আমি শুনাতে পারি। হুযুর নবী করীম (সাঃ) বললেন, অন্যদের কাছ থেকে কুরআন শুনতে আমি পসন্দ করি। এ কথা শুনার পর আমি সূরা নিসা পড়তে শুরু করি। যখন আমি এ আয়াতটিতে পৌঁছালাম, ফাকায়ফা ইযা যে'না মিন কুল্লে উম্মাতীন বেশাহীদেওঁ ওয়া যে'নাবেকা আলা হাউলায়ে শাহীদা (অর্থাৎ সে সময়টিতে কেমন অবস্থা হবে যখন আমরা প্রত্যেক জাতির নবীকে সে জাতির সামনে দাঁড় করিয়ে তাদের হিসাব নেবো এবং তোমাকেও তোমার জাতির সামনে দাঁড় করিয়ে সে জাতির হিসাব নেবো) তখন আল্লাহ্‌র রসূল বলে উঠলেন, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসূদ বলেন, আমি দেখলাম যে, আল্লাহ্‌র রসূলের দু'চোখ হতে টপ টপ করে অশ্রু ঝড়ছে।

নামাযের প্রতি তাঁর (সাঃ) এত দৃষ্টি ছিল যে, ভীষণ অসুস্থাবস্থায় যখন আল্লাহ্‌র তরফ হতে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে তখনও তিনি অন্য ব্যক্তির সাহায্যে মসজিদে নামায পড়তে যেতেন। একদিন অসুস্থতার কারণে নবী করীম (সাঃ) নামাযে যেতে পারেন নি। হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নামায পড়তে বললেন। অল্পক্ষণ পরে কিছু সুস্থ অনুভূত হলে তিনি দুই ব্যক্তির উপর ভর দিয়ে মসজিদের দিকে চলতে শুরু করলেন। আর তাঁর চলার সেই অবস্থা হযরত আয়েশা (রাঃ) এভাবে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পা দু'টি মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল।

এ জগতে কারও সন্তুষ্টি ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে হাত তালি দেয়া হয়, আরব দেশেও এ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র যিকিরকে এত পসন্দ

করতেন যে, সন্তুষ্টি ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যিকরে ইলাহীকে বেছে নিয়েছেন। একবার হযরত রসূল করীম (সাঃ) কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন নামাযের সময় হয়ে গেলে তিনি (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নামায পড়াতে বললেন। ইতোমধ্যে তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে তিনি মসজিদে চলে গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন। যখন দেখলেন যে, হুযুর (সাঃ) মসজিদে এসে গেছেন তখন তারা ব্যস্ত হয়ে হাত তালি দিতে শুরু করে। এর দ্বারা প্রথমতঃ হুযুর (সাঃ)-এর আগমনে খুশীর প্রকাশ এবং দ্বিতীয়তঃ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইহা বলা যে, তোমার ইমামতী শেষ হয়েছে। হযরত আবুবকর (রাঃ) পিছনে চলে আসলেন এবং হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর জন্য ইমামের জায়গাটি খালি করে দিলেন। নামাযের শেষে হুযুর (সাঃ) বললেন, হে আবুবকর যখন আমি তোমাকে নামায পড়াতে হুকুম দিয়েছিলাম তখন তুমি পিছনে কেন সড়ে গিয়েছো? হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার বর্তমানে আবু কোহাফার পুত্রের কি দুঃসাহস যে সে নামায পড়ায়?' তারপর তিনি (সাঃ) সাহাবাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা হাত তালি কেন দিয়াছিলে? খোদার স্মরণের সময়ে হাততালি দেয়া উচিত নয়। নামাযের সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে হাত তালি নয় উচ্চস্বরে খোদার নাম করো। এরূপ করলে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়ে যাবে।

ইবাদতের ব্যাপারে তিনি বাড়াবাড়িকে পসন্দ করতেন না। একবার হুযুর (সাঃ) দেখলেন তার গৃহে একটি দড়ি বাঁধা আছে। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইহা কিসের জন্যে? বল হলো, হযরত যয়নাব ইবাদত করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে যান তখন এ দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে ইবাদত করেন। তিনি (সাঃ) বললেন, এরূপ করা উচিত নয়। এ দড়িটি খুলে নাও। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত অনায়াসে যতটুকু ইবাদত করা যায় ততটুকু ইবাদত করা।

হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি খোদাকে স্মরণ করেছেন। ঘুমাতে যাচ্ছেন, ঘুম থেকে উঠছেন, খাচ্ছেন, উঁচু জায়গায় চড়ছেন, নীচু জায়গায় নামছেন, বাজারে যাচ্ছেন, ঘরে ঢুকছেন, বাইরে যাচ্ছেন, বাথরুমে যাচ্ছেন, সেখান হতে বের হচ্ছেন তো খোদাকে স্মরণ করছেন। এমন কি আয়নাতে নিজ চেহারা দেখছেন তো বলেছেন।

"আল্লাহুম্মা আহসেন খুলুকি কামা আহসানাতা খালকি" অর্থাৎ হে খোদা! তুমি আমার আখলাককে ও চারিত্র্যকে সুন্দর কর যেভাবে তুমি আমার চেহারাকে সুন্দর করেছো।

আসুন আমরা নিজেদের জীবনে সীরাতে মুহাম্মদীকে (সাঃ) বাস্তবায়িত করে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করি। আমীন।

# ইনকিলাবে হাকীকী

## ( প্রকৃত বিপ্লব )

[ মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ ( রাঃ ) ]

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

( ৫ম কিস্তি )

### পবিত্র গ্রন্থসমূহে বেবিলনীয় সভ্যতার উল্লেখ :

বেবিলনীয় রাজত্ব সম্বন্ধে তওরাতে যে বর্ণনা এসেছে তদ্বারাও কুরআনের বর্ণনার সত্যায়ন হয়। যেমন বাইবেলে এসেছে :

"পরে তাহারা কহিল, আইস, আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগনস্পর্শী এক উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, পাছে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্ন ভিন্ন হই। পরে মনুষ্য সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিয়া সদা প্রভু নামিয়া আসিলেন। আর সদা প্রভু কহিলেন, দেখ, তাহারা সকলে এক জাতি ও এক ভাববাদী, এখন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল ; ইহার পরে যে কিছু করিতে সংকল্প, করিবে, তাহা হইতে নিবারিত হইবে না। আইস, আমরা নীচে গিয়া, সেই স্থানে তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই, যেন তাহারা একে অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে।"

( আদি পুস্তক—১১ : ৪-৭ )

এ উদ্ধৃতি থেকে ইহা বুঝা যায় যে, ইহুদী ইতিহাস অনুযায়ীও বেবিলনীয় লোকদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল অট্টালিকা নির্মাণ। কেননা, তওরাতের এ উদ্ধৃতি থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে ভাষায় বিভেদের কারণ এই যে, কোন সময় বেবিলনের লোকেরা এক উঁচু অট্টালিকা তৈরী করা আরম্ভ করলো যেন উহা তাদের জন্যে নিদর্শনে পরিণত হয় এবং এজন্যে তারা বিক্ষিপ্ততা থেকে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করতে চাইলেন। এজন্যে তিনি তাদেরকে এ আকাঙ্খা থেকে বিরত রাখার জন্যে তাদের ভাষার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিলেন। ফল এই দাঁড়ালো যে, ঐ জাতির ঐক্যে ফাটল ধরলো এবং তাদের শক্তি খর্ব হলো আর তারা ঐসব অট্টালিকাসমূহ নির্মাণে ব্যর্থ হলো।

এ উদ্ধৃতিতে যে কারণ দর্শানো হয়েছে এতো কেবল একটি কেচ্ছা মাত্র। কিন্তু এথেকে এই ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিপন্ন হয় যে, বেবিলনের অধিবাসীরা উচুঁ উচুঁ অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারদর্শী ছিলো। আর এমন সব উচুঁ অট্টালিকাসমূহ তৈরী করতো যেগুলোকে দেখে সন্দেহ জন্মাতো যে, তারা যেন আকাশের সাথে কথা বলছে অর্থাৎ আকাশ স্পর্শ করছে।

কুরআন করীমেও ফেরাউনের ব্যাপারে এ উদ্ধৃতির অনুরূপ একটি কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এ পার্থক্যের সাথে যে, বাইবেলে তো খোদাতা'লার প্রতি এ ধারণা আরোপ করা হয়েছে যে, মানুষ উচুঁ উচুঁ অট্টালিকা নির্মাণ করে পাছে ঐশী মর্যাদা লাভ করে না ফেলে। আর কুরআন করীম এ নিরর্থক ধারণা ফেরাউনের প্রতি আরোপ করেছে যার সত্যতা সম্বন্ধে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আল্লাহ্তালা ফেরাউনের ব্যাপারে বলেছেন যে, সে হামানকে বল্লো যে, 'ফাআও ক্বিদ্লী ইয়া হামানু আলাত্বীনি - ফাজ'আল্লী সারহান্ লা'আল্লী আত্বালি'উ ইলা ইলাহি মূসা-ওয়া ইন্নী লাআযুন্নুহু মিনাল কাযিবীন (সূরা কাসাস : ৩৯ আয়াত)

অর্থাৎ যখন ফেরাউনের সামনে হযরত মূসা আলায়হেস সালাম তাঁর দাবী উপস্থাপন করলেন তখন ফেরাউন উহা শুনে স্বীয় প্রকৌশলী হামানকে ডেকে পাঠালো আর তাকে আদেশ দিলো যে, মিস্ত্রীদের লাগিয়ে দাও এবং এমন উচুঁ অট্টালিকা তৈরী করো ও এমন এমন দূরবীনসমূহ ও মান মন্দির নির্মাণ করো যেন আমি আকাশের রহস্যাবলী দেখতে পারি এবং মূসার খোদাকে বের করে আনি।

এভাবে সূরা মোমেন-এর মধ্যে এসেছে—'ওয়া ক্বালা ফেরআ'উনু ইয়া হামানুব্নি লী সারহান লা'আল্লী আবলুগুল আসবাবা-আসবাবাস্ সামাওয়াতি ফাত্ত্বালি'আ ইলা ইলাহি মূসা-ওয়া ইন্নী লা আযুন্নুহু কাযিবা'। (সূরা মোমেন : ৩৭-৩৮ আয়াত) অর্থাৎ ফেরাউন তার প্রকৌশলী হামানকে বল্লো যে, আমার জন্যে একটি দুর্গ তৈরী করো কিন্তু উহা যেন এতটা উচুঁ হয় যেন উহাতে উঠে আমি আকাশের রহস্যাবলী জানতে পারি এবং মূসার খোদার খোঁজ করতে পারি; এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, আকাশের দিকে উঠে যাই। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এতটা উচুঁ হয় যেন সেখান থেকে আকাশের দৃশ্যাবলী সহজে অবলোকন করতে পারি। সেখানে আমি অতি বিরাটকায় দুরবীন স্থাপন করবো আর মূসার খোদাকে দেখবো আর পরিশেষে বল্লো যে, আর আসলে আমিতো তাকে সর্বৈব মিথ্যাই জ্ঞান করি। অর্থাৎ কেউ যেন ইহা মনে না করে যে, যে খোদার উল্লেখ মূসা করে থাকে হয়তো সে সত্যি। তোমাকে তো আমি একটি উচুঁ অট্টালিকা এজন্যে তৈরী করতে বলছি যেন তাকে আমি অন্বেষণ করতে পারি। আমার এ আদেশের উদ্দেশ্য সন্দেহ করা নয় বরং আমার উদ্দেশ্য মূসার খোদা যে মিথ্যে তা প্রমাণ করে দেখানো।

এভাবে 'আদ' জাতির প্রসঙ্গে আরও একটি আয়াতের উল্লেখ করা যায় যে, তারা বিরাট বিরাট উচুঁ অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করতো। আর উহা এই। আল্লাহ্তা'লা বলেন :

আতাবনূনা বিকুল্লি রী'ইন আয়াতান তা'বাসূন—ওয়া তাত্তাখিযূনা মাসানি'আ লা'আল্লাকুম তাখ্লুদূন-ওয়া ইযা বাত্বাশ্তুম বাত্বাশ্তুম জাব্বারীন। (শূ'আরা : ১২৯-১৩১)

আল্লাহ্ বলেছেন, 'আদ' জাতিকে উদ্দেশ্য করে আমরা বলেছিলাম যে, তোমরা প্রত্যেক পাহাড়ের ওপরে জাঁক-জমকপূর্ণ অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করছো এবং বড় বড় ফ্যাক্টরীসমূহ ও রসায়ন শাস্ত্রের কেন্দ্রসমূহ তৈরী করছো এবং মনে করো যে, তোমরা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। যেভাবে ইউরোপের লোকেরা আজকাল ইহা মনে করে যে, তাদের সভ্যতা চিরস্থায়ী হবে ('মাসনা' অর্থ ফ্যাক্টরীসমূহ ও রাসায়নিক কারখানাসমূহ)। পুনরায় বলেন—যখন তোমরা কোন দেশের ওপরে বিজয় লাভ করো তখন তোমরা ঐ স্থানের সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করে দিয়ে থাকো। আর তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির স্থলে তোমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করো। (জাব্বার অর্থ অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেকে উচুঁ করে যে ব্যক্তি। আর এর আর এক অর্থ অন্য জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিনাশ করে নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করা) ওয়া ইযা বাত্বাশ্তুম বাত্বাশ-তুম জাব্বারীন—থেকে এ ইস্তেমবাত (অর্থাৎ কোন সিদ্ধান্তের ওপরে ভিত্তি করে অনুরূপ ফল বের করা)-ও করা যেতে পারে যে, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের উদ্ভাবন তাদের যুগেই হয়েছিলো। যেমন, যে প্রক্রিয়ায় তারা পাহাড়ে অট্টালিকা নির্মাণ করেছে তাথেকে কতক ঐতিহাসিক এ সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন যে, ঐ জাতি গোলা-বারুদ ও ডিনামাইট উদ্ভাবন করেছিলো। এ অর্থের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হবে যে, তোমরা যুদ্ধের এমন সব সরঞ্জাম উদ্ভব করেছিলে যা খুবই ধ্বংসাত্মক ছিলো। আর তোমরা এতদ্দ্বারা অন্যান্য জাতিকে বিনাশ করে নিজেদের সভ্যতা ও নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চাও।

## পাশ্চাত্য সভ্যতার দর্শন ঃ

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিও এক দর্শনের ওপরে রচিত এবং ঐ দর্শন হলো বস্তুবাদের দর্শন যার ভিত্তি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপরে। এই দর্শনের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা জাতীয়তাবাদের গভীর অনুভূতি সৃষ্টি করে নিয়েছে।

পরম কুরবানী মানুষ তখনই করতে পারে যখন কিনা সে মনে করে যে, এ দুনিয়া ছাড়াও অন্য কোন দুনিয়া আছে। আর যদি আমি অন্যদের জন্যে কুরবানী করি তাহলে আমি এ দুনিয়ার কল্যাণ যদি লাভ না করি তথাপি আমার আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে। কিন্তু যার এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, যা কিছু আছে এ দুনিয়াতেই আছে, সে বলে যে, যা কিছু লাভ হয় আমারই যেন হয় অন্যের যেন না হয়।

অতএব কঠোর জাতীয়তাবাদ বস্তুবাদের ফসল। আর পরে এর আর একটি ফসল ইহাও যে, বিলাস-বৈভবের আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। প্রত্যেক প্রকারের আরাম-আয়েশের

জিনিসপত্র—খাদ্য, পানীয়, পরিধানের জিনিষপত্রে আধিক্যের অভিলাসও বস্তুবাদ থেকে জন্ম নেয়। কেননা, মানুষ ইহা মনে করে যে, যা কিছু আমার ভোগ করা দরকার এ দুনিয়াতেই ভোগ করা উচিত। অতএব যত আনন্দ-স্ফূর্তি করতে পারো করে নাও। এই কারণেই পাশ্চাত্য সভ্যতা আরাম-আয়েশকে চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছে দিয়েছে।

## রোমান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে পার্থক্য ঃ

রোমান সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে পার্থক্য এই যে, রোমানদের মধ্যে আইনের শাসন ছিলো। আর এ কারণে তাদের দর্শন পূর্ণ থেকে অংশের Generalisation থেকে partirularisation-এর দিকে আবর্তিত হতো। যেমন, আমি গ্রীক সভ্যতা ও দর্শনকে রোমান সভ্যতা ও দর্শনের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। দর্শনের সকল শাখা-প্রশাখা এ নীতির অনুসারী। তাদের চিকিৎসা শাস্ত্র দেখো তাহলে দেখবে যে, উহার ভিত্তিও সামগ্রিতার ওপরে রাখা হয়েছে। আবার পরে এথেকে আংশিক ফল গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের ঐশ্বরিক দর্শনের অবস্থাও ইহাই। সামগ্রিকতাকে উপস্থাপন করে তাথেকে আংশিক ফল গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত সভ্যতার ভিত্তি যদিও বস্তুবাদের ওপরে রচিত অর্থাৎ আংশিক ফল উপস্থাপন করে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ওপরে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। সামগ্রিকতাকে হয় তো এসব লোক আংশিক ফলের ভিত্তিতে গ্রহণ করে অথবা আবার আংশিক ফলের অস্তিত্বকেই বাজে ও অনর্থক নিরূপণ করে থাকে। একজন হেকিমি চিকিৎসক প্রত্যেক রোগকে দেহের চারটি উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নির্ধারণ করে দিয়ে সমগ্র চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে রোগ নির্ণয় করতঃ চিকিৎসা করে। কিন্তু নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির একজন বিশেষজ্ঞ প্রত্যেক রোগের বিশেষ বিশেষ চিহ্নাদির সন্ধান করতঃ ঐসব বিশেষ চিহ্নাদি অনুযায়ী উহার চিকিৎসা করে থাকেন। আর মোটেই উহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না যে, সর্ব প্রকার রোগ-ব্যাধিকে কোন বিশেষ শৃঙ্খলের কড়া নিধারণ করেন।

জ্ঞাত ইতিহাসের সাথে যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে তাতে পার্থিব আন্দোলন বা সভ্যতার মধ্য থেকে এই পাঁচটি সভ্যতাই পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয়। আর সারা দুনিয়ার শাসন ব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতাগুলোর ওপরে এর প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। বাকী অন্যসব শাসন ব্যবস্থা ও দর্শনকে উহার অধীনস্থ বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি এ সবের সাথে তাদের মতবিরোধ থাকে তাহলে তা আংশিক। কতক দর্শন এসব দর্শন থেকে আলাদা হয়ে দৃশ্যতঃ একটি নতুন আকার ধারণ করে গিয়েছে এবং খুব সামান্য পরিবর্তনের সাথে কতক ঐসব দর্শনের মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে।

(চলবে)

# পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

## সূচনা

বেশ কিছুকাল যাবৎ পাক্ষিক আহমদীতে 'চলতি দুনিয়ার হালচাল' লিখে আসছি। এ সংখ্যা হতে 'পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত' এই শিরোনামে লিখতে মনস্থ করেছি। উদ্দেশ্য বৈচিত্র সৃষ্টি ও লেখায় গভীরতা বাড়ানোর প্রয়াশ। 'চলতি দুনিয়ার হালচাল' এর মাঝে কিছুটা হালকা ভাবের ছোঁয়াচ অনুভূত হয়। তা'ছাড়া 'পীড়িত' শব্দটির মাঝে সেবার আহ্বান পাওয়া যার। দৈহিক পীড়াকে ক্ষীণ করে না দেখেও বলা যায় অবক্ষয়ের পীড়া খুবই ভয়াবহ। এর ব্যাপক আগ্রাসনে সমাজ ( বিশ্ব সমাজ বল্লে মোটেও অত্যুক্তি হবে না ) মারাত্মক অশান্তিতে ভোগে। সৃষ্টির শেরা জীব মানুষ মানবতাবোধ হারিয়ে ফেলে। তখন সে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়। এই তুখোড় বুদ্ধিমান জীবটি তার বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রযুক্তি সবকিছুকে নিজের হীন স্বার্থ উদ্ধারে নিয়োজিত করে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ তার কাছে হাসি-বিদ্রূপের উপকরণে পরিণত হয়। এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটিতে :

### স্বাধীনতা ভীষণ অসুস্থ !

ফরিদা সরকার ( শিউলী )

পৃথিবীটা কি ভীষণ অসুস্থ,
রাজপথে জনপদে চোখে চোখে অসুখ,
আকাশে-বাতাসে জীবাণু ছড়ায়,
শরীরে অসুখ হয়, অসুখ হৃদয়ে।
পৃথিবীটা কি ভীষণ অসুস্থ,
অসুস্থ স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা—
মানবিক মূল্যবোধ,
অসুস্থ শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য।
পৃথিবীটা কি ভীষণ অসুস্থ
অসুস্থ মানুষের পবিত্র বিশ্বাস,
শান্তির আশ্বাস—
অসুখ সামাজিক সম্পর্কেও।
পৃথিবীটা কি ভীষণ অসুস্থ,
শিক্ষা শুধু রাজনীতি, যুদ্ধময় উপস্থিতি,
সেবা শুধু স্বজনপ্রীতি,
দায়িত্ব কেবল পদোন্নতি।
পৃথিবীটা কি ভীষণ অসুস্থ,
নগ্নতার, যৌনতার প্রতিযোগিতা
সেখানে—
শিল্পে, চলচ্চিত্রে, পত্রিকায়.....
দিনে দিনে মানুষের সুন্দর রুচিবোধ
হচ্ছে উধাও !

( অবশিষ্টাংশ ১৭ পাতায় দেখুন )

# পত্র-পত্রিকা থেকে

## সীরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপিত

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদ-যাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা গত ১৮ জুলাই আমির মোবাশ্বের রহমানের সভা-পতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মীর মোহাম্মদ আলী বলেন, ইসলাম মানেই শান্তি। আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে হানাহানিতে লিপ্ত আরবদের সেই শান্তির সুধা পান করিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)। তিনি বলেন হানাহানি নয় ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমেই ইসলাম তথা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশিত পথ অনুসরণ সম্ভব।

## আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সালানা জলসা সম্পন্ন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যের ৩২তম সালানা জলসা ২৭শে জুলাই লণ্ডনস্থ ইসলামাবাদের টিলফোর্ডে সমাপ্ত হয়। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলিফা মির্যা তাহের আহমেদ জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে বিশ্বব্যাপী জামাতের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। উল্লেখ্য যে, চলতি বৎসর বিশ্বব্যাপী ত্রিশ লক্ষ চার হাজার পাঁচশত লোক আহমদীয়া মুসলিম জামাতে বয়াত গ্রহণ করেন।

(৩১-৭-৯৭ ইং তারিখের দৈনিক আজাদীর সৌজন্যে)

## জামালপুরে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা উদযাপন

সংবাদদাতা: জামালপুর জেলার নয়াপাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে বিশ্ব মানবতার একমাত্র আদর্শ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সীরাত (জীবন আদর্শ) বাস্তবায়নে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গত ১৮ই জুলাই বাদ জুম্মা জামাতের প্রেসিডেন্ট সলিমুল্লাহ এর সভাপতিত্বে এক মহান সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

আজিজুর রহমান বাবুলের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নাতে রসুল পাঠ করেন ফেরদৌস আহমেদ। বক্তৃতা করেন ডাঃ মোঃ শামছুজ্জোহা লকেট, হাবিবুর রহমান, মুসলেহ উদ্দিন, আবু সামা, বেলাল, সাব্বির আহমেদ এবং আহমদ তারেক মুবাশ্বের। সভায় বক্তারা বলেন এই দিনটি ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) জলসা পালন করা প্রয়োজন। কারণ ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে সভা মিছিল, মিটিং, আলোকসজ্জা করে উক্ত অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ফলে মানুষ মনে করে এই দিনটি একটি আনন্দের দিন। আসলে আমাদের জানা দরকার যে. এই দিনটির কি গুরুত্ব। এই দিন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন তাই দিনটি আনন্দের কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানা যায় এই ১২

রবিউল আউয়ালে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। দেখা যায় দিনটি যেমন আনন্দের তেমন দুঃখেরও। তাই এই দিবসে আনন্দ উৎসব না করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন মানুষের সামনে তুলে ধরে সমাজ সংসারকে অবক্ষয়ের করাল গ্রাস থেকে রক্ষার জন্য বিশ্ব মানবতার প্রতি আহবান জানানো হয়।

৮০০ হিজরি কুর্দীস্থানের জনৈক আমীর এই ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) জলসার প্রবর্তন করেন। এবং ১৯২৭ সাল আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মির্জা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) এই সীরাতুন্নবী জলসার প্রবর্তন করেন। বর্তমান বিশ্বের ১৫৭টি দেশের আহমদীরা ছাড়াও বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের কোন কোন সাম্প্রদায়ও ১২ই রবিউল আউয়ালে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা পালন করেন।

( ৩১-৭-৯৭ ইং তারিখের দৈনিক জাহান-এর সৌজন্যে )

## মৌলবাদের উত্থানে উদ্বেগ সবখানে

মতিউর রহমান চৌধুরী

মৌলবাদের উত্থানে উদ্বেগ সবখানে। দেশে প্রচণ্ড উদ্বেগ, বিদেশেও কম নয়। বাংলাদেশকে সাহায্যদাতা গোষ্ঠী রীতিমত বিচলিত। সরকারের ভেতরও উদ্বেগ। মৌলবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে। সমাজ সচেতন মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠার শেষ নেই; দাতাদের উদ্বেগ—দেশটা যাচ্ছে কোন দিকে। তারা জানার চেষ্টা করছেন হঠাৎ করে কেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। বিগত নির্বাচনে তো দক্ষিণপন্থী দলগুলোর ভরাডুবি ঘটেছিল। কয়েক মাসের মাথায় তারা কিভাবে শক্তি সঞ্চয় করলো। এর পেছনে কারা কাজ করছে। কিভাবে করছে। এই পরিস্থিতি প্রতিবেশী দেশ ভারতকেও ভাবিয়ে তুলেছে। সেখানকার কর্মকর্তারা অংক কষতে শুরু করেছেন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মূল্যায়ন করছেন; অতীতের ভুলগুলো নতুন করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৌশল গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করছেন। ঢাকার রাস্তায় উচ্চারিত 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান' শ্লোগান শুনে সরকারের মধ্যেই শুধু প্রতিক্রিয়া হয়নি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বিএনপি'র মধ্যে যারা মডারেট হিসেবে পরিচিত তারাও নতুন করে হিসেব মেলাতে শুরু করেন। মানিক মিয়া এভিনিউর মহাসমাবেশে ইসলামি দলগুলোর নেতারা নিজেদেরকে মৌলবাদী হিসেবে ঘোষণা দেয়ায় পশ্চিম দুনিয়ায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তারা বলছেন বাংলাদেশ কি আলজেরিয়ার পথ ধরলো? সরকারের ভূমিকা নিয়েও নানা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বলা হচ্ছে, বর্তমান সরকার কি মৌলবাদের উত্থান ঠেকাতে সক্ষম? রাজনৈতিক সমীক্ষকেরা বলছেন, আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার পক্ষের দল এটা ঠিক। কিন্তু একমাত্র শক্তি নয়। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি প্রধান

দল বিএনপিসহ নানা দলে বিভক্ত। নানা গোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত। শুধু স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে বিকশিত করতে হবে? আওয়ামী লীগ এককভাবে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তির দাবিদার হতে পারে না। আওয়ামী লীগ সংগঠিত, তবে যথেষ্ট সংগঠিত শক্তি নয়। '৭৫ সালের পর আওয়ামী লীগ '৯৬ সালে ক্ষমতায় এসেছে, তা-ও অন্য দলের সমর্থনে, এটা বিবেচনায় রাখতে হবে; শতকরা ৩৩ ভাগ ভোট আওয়ামী লীগের বাক্সে পড়েছে। বাকি ভোট আওয়ামী লীগ বিরোধী শিবিরে ভাগাভাগি হয়েছে। এটা স্পষ্ট, শুধু শ্লোগান দিয়ে মৌলবাদকে রোখা যাবে না। কি কৌশলে মৌলবাদী শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে তার কৌশল নির্ণয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। আওয়ামী লীগের ব্যানারে মেরুকরণ ঘটানো সম্ভব নয়। ঘটাতে হবে সম্মিলিত শক্তির জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে। এই সরকারের রাজনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য। এটা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এবং অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারের কারণে '৯৬ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা এক দল নয়, ঐক্যমতের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতীয় পার্টি এবং জাসদ (রব) সরকার গঠনে নিঃশর্ত সমর্থন দেয় এবং সরকারে যোগদান করে। এর উদ্দেশ্য ছিল সংকটগ্রস্ত বাংলাদেশের জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করা, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং স্থিতিশীলতা অর্জন করা। এটা জনগণের মধ্যে প্রচুর আশাবাদ জাগায় এবং দেশের বাইরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রধানমন্ত্রী বহুবার বলেছেন, জাতীয় সকল নীতি ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে। বাস্তবে তা উপেক্ষিত হচ্ছে! ফলে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক সংকট যেমন গভীরতর হচ্ছে, সরকারের রাজনৈতিক ভূমিকাও তেমনি বিতর্কিত হচ্ছে। ১৪ মাসে সরকার প্রমাণ করতে পারেনি জাতীয় নীতি নির্ধারণে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। এমনকি আজ পর্যন্ত ঐক্যমত্যের সরকারের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিও জনগণের সামনে হাজির করতে পারেনি। এরকম কোন কর্মসূচি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করা হয়নি। একদিকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার তাগিদ অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই স্ববিরোধিতা ঐকমত্যের প্রশ্নকে দুর্বল করেছে। সরকার-বিরোধী শক্তিকে উৎসাহিত করেছে। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণতই আমলাতান্ত্রিক। অনেক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সরকারে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে অবহিত করা হয় নি। বাজেট, ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি পানি চুক্তি, দু'দিনের সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা, স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রণয়ন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি এসব বিষয় নিয়ে আগে কোন আলোচনা হয়নি। সর্বশেষ জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি; ঐকমত্যের সরকারের দুই শরিক দল জাতীয় পার্টি ও জাসদ (রব) এই সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হয়েছে। প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছে। রেডিও-টেলি-

ভিশনের স্বায়ওশাসন সম্পর্কিত আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণে কমিটি গঠন করা হয়েছে একজন আমলার নেতৃতে। জনসংস্কার কমিটির মত কমিটিও আমলার নিয়ন্ত্রণে গঠিত হয়েছে। জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার কাঠামোর রিপোর্ট ও আমলার হাতে বন্দি। ফলে সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ জাতির সামনে রাজনৈতিক টার্গেট নির্ধারণ করতে পারেনি। ১২ কোটি মানুষের দেশে কি ধরনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক উদ্যোগ নিয়ে সরকার জাতির আশা-আকাঙ্খা পুরণ করবে তা জনগণ জানার সুযোগ পায়নি। ১৪ মাস আওয়ামী লীগ নিজস্ব দলীয় নেতৃত্ব ও চিন্তা-চেতনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। জনগণের জন্য, স্বাধীনতার চেতনার জন্য ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য জনগণের কাছে মৌলিক অঙ্গীকারগুলো স্পষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। বলা হচ্ছে, সংসদই হবে সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু সংসদ অর্থবহ হচ্ছে না। সংসদীয় কমিটিগুলো এখনো হয়নি। সংসদে অবস্থানকারী দল ও ব্যক্তির মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হছে না। বলা হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতার কথা। কিন্তু কার্যত দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই প্রধান্য দেয়া হচ্ছে। ফলে সহযোগিতার কথা। কিন্তু কার্যত দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। ফলে সহযোগিতা যেমন নিশ্চিত হচ্ছে না তেমনি সংসদকেও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাচ্ছে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রয়োজনে বৃহত্তর বিরোধী দল বিএনপিকে সরকার আস্থায় নিতে পারছে না। বিএনপি ধীরে ধীরে রাজপথের দিকেই এগিয়ে যাছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা বেগম খালেদা জিয়াকে বিক্ষুব্ধ করেছে। কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ ও মন্ত্রীবর্গের আক্রমণাত্মক মনোভাব সরকার বিরোধী রাজনীতির দ্রুত মেরুকরণ ঘটার সুযোগ করে দিচ্ছে। খালেদা জিয়া ও বিএনপিকে চরমপন্থী জামায়াত ও অন্যান্য দলের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য কঠিন এবং নতুন তো বটেই। তাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। নেতাদের অহমিকা পরিহার করতে হবে। এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হবে না যা ঐকমত্যের সরকারের ভিত্তি বিনষ্ট করে। এটা বিবেচনায় রাখতে হবে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির টার্গেট হচ্ছে প্রথম ঐকমত্যের সরকারে ভাংগন ধরানো। তারপর আওয়ামী লীগকে একঘরে করা। এবং তারপর আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তিকে সুসংহত করে আন্দোলন বেগবান করা।

( ২৬-৮-১৭ ইং তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা সৌজন্যে )

## মুফতি আমিনীর মুতায়া ম্যারেজ

ফজলুল হক খান

ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনী মুতায়া ম্যারেজ করেছে। না, সেকথা বলছি না এবং এমন কোনো তথ্যও আমাদের হাতে নেই। তবে সে মুতায়া

ম্যারেজকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছে। সে মুফতি মানুষ, তার দৃষ্টিতে বৈধ এমন একটি কাজ করে থাকলেও কারো কিছু বলার নেই। তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো কোনো ব্যক্তি এ কাজটি করলে তাকে মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করে আমিনী খোমেনীরা মিলে মিশে কোমরে গামছা বেঁধে, কাছা মেরে ইসলাম গেলো, ইসলাম গেলো বলে মাঠ গরম করে ফেলতো। তখন মুতায়া ম্যারেজ হয়ে যেতো ভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের কালচার লিভ টুগেদার।

মুফতি আমিনীর বিরুদ্ধে শুধু মুতায়া ম্যারেজ নয়, আরো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। বিগত ১১ আগষ্ট, ১৯৯৭ দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম পাতায় 'মুফতি আমিনী সমাচার' ভাষ্যে তিনটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে :

(১) মুফতি ফজলুল হক আমিনীর সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সঙ্গে গোপন বৈঠকের অডিও ভিডিও টেপ নাকি রয়েছে।

(২) বর্তমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে জঘন্য কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে যা টেপ করা হয়েছে বলে উত্থাপিত অভিযোগে দাবী করা হয়েছে।

(৩) মুফতি আমিনী ইরান থেকে ফিরে এসে মুতায়া ম্যারেজ জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অদ্যাবদি এসব উত্থাপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে মুফতি আমিনীর কোনো প্রতিবাদ পত্র-পত্রিকায় হয়েছে বলে চোখে পড়ে নি। মুফতি আমিনী আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সদস্য কিনা, তাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকের সত্যতা এবং ঘনিষ্ঠতা কতটুকু, সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য সম্পর্কিত অভিযোগ-গুলো খতিয়ে দেখার দায়িত্ব সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা মন্ত্রণালয়ের। এ ব্যাপারে আমার কোনো মন্তব্য নেই। তবে ফজলুল হক আমিনী একজন মুফতি, মুতায়া ম্যারেজ জায়েজ এ তথ্য সে কোথায় ফেলো তা অবশ্য জিজ্ঞাসার বিষয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান আহলে-সুন্নত-আল জামাত-এর অনুসারী অর্থাৎ সুন্নী মুসলমান। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মযহাব সুন্নী মুসলমানদের উপর চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না। ইসলাম ধর্মের বিধান মোতাবেক মুতায়া ম্যারেজ হারাম। হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী ( সঃ ) খায়বার যুদ্ধকালে মেয়েদের সঙ্গে মুতায়া বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন। সাবরা জুহানী এবং আবু হুরায়রা ( রাঃ ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ মতামত রয়েছে।

সাহাবী এবং আলেমদের আমল এ হাদীস অনুসারে রয়েছে। মুতায়া বিষয়ে একমাত্র ইবনে আব্বাস ( রাঃ ) থেকে কিছুটা অবকাশ আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ( সঃ ) থেকে বর্ণিত এসব হাদীসের পরিপেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে তিনি স্বীয় মত প্রত্যাহার করেন।

অধিকাংশ আলেম মুতায়া হারাম হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম ছাওরী, ইবন মুবারক শাফিই, আহমদ ও ইসহাক (রঃ) এবং ইমাম আবু হানিফাও একই মত পোষণ করেন। তিরমিযী শরীফে যেমন মুতায়া ম্যারেজ জায়েজ এমন কোনো তথ্য নেই, তেমনি পবিত্র কোরআনের পর বিশ্বস্ততায় প্রথম স্থানের অধিকারী বোখারী শরীফেও এমন কোনো তথ্য নেই। তবে শিয়া মজহাবে মুতায়া ম্যারেজ জায়েজ, শুধু জায়েজ নয় পুণ্যের কাজ বলে পরিগণিত। শিয়া মজহাবে মুতায়া ম্যারেজকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত মুতায়া এবং সম্মিলিত মুতায়া। পঞ্চপাণ্ডব কাহিনীর ন্যায় মুতায়া ম্যারেজের মাধ্যমে নেকী অর্জনের যে বর্ণনা মুতায়া অধ্যায় 'জামিউল কাফি' এবং 'খোমেনী মওদুদী দু'ভাই' পৃষ্ঠা-৩২-এ রয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে না করাই শ্রেয়। তবে শিয়া মতবাদে মুতায়ার ফজিলতের একটু বর্ণনা না দিলেই নয়। "মুতায়া করার পর যখন গোসল করা হয় তখন ওই গোসলের পানির প্রতিটি বিন্দু থেকে সত্তরজন ফেরেশতা সৃষ্টি হয় এবং তারা কিয়ামত পর্যন্ত মুতায়া-কারীর জন্য কল্যাণ কামনা করতে থাকে" (বুরহানুল মুতায়া-পৃষ্ঠা-৫০)।

"হুজুর (সঃ) বলেছেন, যে একবার মুতায়া করল সে আল্লাহর নারাজী হতে মুক্তি পেয়ে গেলো। যে দুইবার করবে নেককারদের সহিত তার হাসর হবে। যে তিনবার মুতায়া করবে সে আমার সহিত বেহেশতে থাকবে।" (নাউজুবিল্লাহ)

(মানহাজুচ্ছাদেকীন পৃষ্ঠা ৩৫৬, আহছানুল ফতওয়া পৃষ্ঠা ৯২, ৯৩- তুহফা ইসনা আশারিয়া দ্রঃ)

কি জঘন্য মিথ্যাচার মহানবী (সঃ) এর নামে। কোনো পাপিষ্ঠ দুরাচার ছাড়া মহা-নবী (সঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এমন মিথ্যাচারের জন্ম দিতে পারে? মুফতি আমিনী আল্লাহ রাসূলের ইসলাম, পবিত্র কোরআন হাদীসের মূল মতবাদে বিশ্বাসী সুন্নী সম্প্রদায়ের তরিকা বাদ দিয়ে হঠাৎ করে শিয়া মতালম্বী মুতায়া ম্যারেজের ইসলামে আসক্ত হলেন কেনো? ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধর্মের নামে ধর্মের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার নজীর ভুরি ভুরি রয়েছে। কিন্তু মহানবী (সঃ) সম্পর্কে এমন মিথ্যাচারকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা অত্যন্ত জঘন্য। এসব আমিনী খোমেনিরা যখন ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ আলী আসগর, কবি শামসুর রাহমান, আজকের কাগজের সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ-এর মতো ব্যক্তিত্বকে মুরতাদ বলে গালি দেয় তখন একজন মুসলমান হিসেবে কষ্ট হয়। অশিক্ষিত মূর্খের দল আমিনীগংরা মুরতাদ শব্দের সংজ্ঞা জানে না, তাই যখন তখন যাকে তাকে মুরতাদ বলতে তাদের বিবেকে বাঁধে না। যারা মহানবী (সাঃ)-এর নামে এ ধরনের মিথ্যাচার রচনা করতে পারে, সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে মর্যাদা হানিকর কথা বলতে পারে মুরতাদ তারা, ব্যবসায়িদের গালি দিলে কেউ মুরতাদ হয় না। তৃতীয় শতাব্দির সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ইমাম আবু যোরআ (রাঃ) পরিষ্কার রূপে বলেছেন, "যদি তুমি

কোনো ব্যক্তিকে দেখ যে, সেকোনো ছাহাবীর মর্যাদাহানিকর কথা বলে তবে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিও যে, সে যিন্দীক ইসলাম বিদ্বেষী, ইসলামের কুঠারাঘাতকারী" (এসাবা—১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮)। উল্লেখ্য যে, ইসলামের ছদ্মাবরণে এক ধরনের মুরতাদ মুফতি ফজলুল হক আমিনী ইরান থেকে এসে মুতায়া ম্যারেজ জায়েজ এমন ফতোয়া দেয়ার পিছনে মূল রহস্য কি? মুতায়া ম্যারেজের সঙ্গে ইরানের এবং ইরানের সঙ্গে আমিনীর সম্পর্ক কি? তবে কি মুফতি আমিনী ইরানী শিয়া মতাবলম্বীদের এজেন্ট? আমিনিরা কি জানে শিয়া ইসলামের সঙ্গে সুন্নী ইসলামের তফাৎ কতোটুকু?

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের নেতা খোমেনী ইসনা আশারিয়া শিয়া মতাবলম্বী এবং ফেকহে জাফরীর অনুসারী। ফিকহে জাফরী মুসলমানদের কোরআনে বিকৃতি আছে এবং সসম্মতি-ক্রমে জিনা জায়েজ বলে সমর্থন করে। সকল সাহাবায়ে কেরামদের (হজরত আলী (রাঃ) এবং আরো চারজন মতান্তরে ছয়জন ব্যতীত) কাফের মুরতাদ বলা ইবাদত মনে করে। খোমেনীর ভাষায়, "যত নবী এসেছেন ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই এসেছেন। তাদের মিশনই ছিল জগতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তারা কেউই এ ব্যাপারে সফলকাম হতে পারে নি। এমন কি সর্বশেষ নবী যিনি মানুষের কল্যাণের জন্যে এসেছিলেন, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন তিনিও এ ব্যাপারে সফল কাম হতে পারেন নি।" (নাউ-জুবিল্লাহ) (ইত্তেহাদ ও এক জেহেতি ইমাম খোমেনীর দৃষ্টিতে দ্রঃ)।

আমিনী গংরা বর্তমান ইরানে সুন্নী মুসলমানদের করুণ চিত্র সম্পর্কে কি কোনো খোঁজ খবর রাখে? খোমেনীর আমলে ইরানে সুন্নী মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের করুণ কাহিনীর চিত্র তুলে ধরে দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'মাসিক আতত্তাওয়িযাহ' অক্টোবর সংখ্যা ১৯৮৭। এতে বলা হয়, হিজরী দশম শতাব্দি পর্যন্ত এখানে সুন্নীদের প্রাধান্য ছিলো। ইমাম মুসলিম আল বেরুনি—আল্লামা সারাখসী প্রমুখ মনীষী এবং বহু সাহিত্যিক, কবি ফোকাহ ও ওলা-মাদের জন্মভূমি ইরান। ১৯১৫ সালে ইসমাইল সফরী ক্ষমতা দখলের পর সুন্নিদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। সুন্নী নির্মূলই ছিলো তার মূল লক্ষ্য। তার নিষ্ঠুরতার কাহিনী অত্যন্ত মর্মবিদারক। এরপর থেকে সুন্নী মুসলমানদের সেখানে অবশ্য দাবিরে রাখার চেষ্টা তৎপরবর্তী দণ্ডমুণ্ডের মালিক প্রায় কর্মকর্তাই অল্প বিস্তর করেছেন। কিন্তু খোমেনীর ক্ষমতা দখলের পূর্ব পর্যন্ত ইসমাইল সফবীর ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি ঘটে নি। সেদিন খোমেনীর নির্যাতন থেকে সুন্নী মুসলমানদের প্রতি মৌন সমর্থন ছিলো এমন শিয়ারাও রক্ষা পায়নি। এমনকি নির্বিচারে সেদিন সুন্নী নিধনে অসম্মতি জ্ঞাপনের অপরাধে কোনো কোনো শিয়া নেতাকেও পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিলো। এসব তথ্য আমিনিদের জানা থাকলে মুতায়া ম্যারেজের ইসলামে আসক্ত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না; অবশ্য আমিনী নিজে শিয়া মতাবলম্বী হলে ভিন্ন কথা।

এটা ইরান নয়, আফগানিস্তান নয়, বাংলাদেশ। এদেশের শতকরা অন্তত ৯৫ জন

মুসলমান আহলে সুন্নত আল জামাতের অনুসারী। এরা আল্লাহ এবং রসুল প্রদত্ত ইসলামে বিশ্বাসী, আমিনী খোমিনী এবং মওদুদীর মুতায়া ম্যারেজের ইসলামে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের ধর্মপ্রাণ সুন্নী মুসলমানদের অজ্ঞতা এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে আমিনীগংরা এদেশে মুতায়া ম্যারেজের ইসলাম প্রতিষ্ঠার চক্রান্তে লিপ্ত। সঙ্গে জোট বেঁধেছে কিছু অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মোল্লার দল—যাদের কোরআন হাদীসের মূল মতবাদে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয় নি। বিশ্বের মুসলমানদের ইতিহাস জানার বিদ্যাবুদ্ধির অভাব, জন্মলগ্ন থেকেই বিকৃত ইসলাম নিয়ে নাড়াচাড়া—এসব অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত মোল্লার দলের মুতায়া ম্যারেজের হোতা আমিনী, খোমেনী, মওদুদিদের ইসলামের সঙ্গে আল্লাহ রসুলের ইসলামের তফাৎ জানার কথা নয়।

আসলে আমিনীরা কি চায়, কোন মতবাদে বিশ্বাসী তা হয়তো তারা নিজেরাও জানে না। স্বার্থের কাছে যারা আল্লাহ এবং রাসূলের ধর্মকে বিকিয়ে দিতে পারে তাদের পক্ষে মাফিয়া চক্রের সদস্য হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমিনিদের মুতায়া ম্যারেজ প্রীতি দেখে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় - তারা সুন্নী মতবাদে বিশ্বাসী নয়। সুন্নী মতবাদে বিশ্বাসী হলে ইরানে সুন্নী মুসলমানদের গগনবিদারী আর্তনাদ কেনো তাদের কানে পৌঁছেনি?

ইরানে যখন সুন্নী মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করা হয় তখন আমিনী গংরা কোথায় ছিলো? ইরানে সুন্নী মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা এবং নির্যাতন বন্ধের প্রতিবাদে মিছিল মিটিং স্লোগানে ঢাকার রাজপথ উত্তপ্ত হয়নি কেনো? তখন কি এদেশে প্রচণ্ড শীত ছিলো, রাস্তায় কি বরফ পড়েছিলো? না, বরফ রাস্তায় পড়েনি, পড়েছিলো মুতায়া ম্যারেজের হোতাদের অন্তরে। ইরানে সুন্নী মুসলমানদের করুণ আর্তনাদ আমিনীগংদের হৃদয়কে ব্যথিত করেনি বরং মনে মনে তারা খুশিই হয়েছিলো মুতায়া ম্যারেজের সুবর্ণ সুযোগ লাভের আশায়।

ধর্ম ব্যবসায়িদের দ্বারা পবিত্র কোরআন হাদীসের মূল মতবাদ বিকৃতির অপচেষ্টা প্রতিরোধে সুন্নী সম্প্রদায়ের আলেম ওলামাদের সজাগ হতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে, ইরানে সুন্নী সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বিকৃত এবং বাতেল মতবাদে বিশ্বাসী আমিনী, খোমেনী মওদুদিদের এখনই প্রতিহত করা সম্ভব না হলে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মুসলমানদের ভবিষ্যত শংকিত, তাদের ওপর আল্লাহ রাসূলের ইসলামের পরিবর্তে চাপিয়ে দেয়া হবে মুতায়া ম্যারেজের ইসলাম। তাই কোরআন হাদীসের মূল মতবাদ বিকৃতিকারীদের প্রতিহত করার জন্যে সুন্নী সম্প্রদায়ের আলেম ওলামাদের এক্ষুণি এগিয়ে আসতে হবে দীপ্ত কঠিন শপথ নিয়ে। শুধু বিকৃতিকারিদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে ঈমানের সর্বশেষ স্তরে অবস্থানের কোনো সুযোগ নেই।

ফজলুল হক খান : প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক

( ২১/৮/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে )

## কার না কার

( করো, কোর না )

( একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক )

মূল সংকলক : হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল ( রাঃ ), সিভিল সার্জন

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

( অষ্টম কিস্তি )

- তুমি সতর্ক দৃষ্টি রাখো যে, তোমার সন্তানেরা কোন লোকের নিকট কিছু চায় তো না।
- তুমি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে যে, তোমার সন্তানেরা গালি ও খারাপ ভাষা মুখে না আনে।
- যদি তুমি কোথাও বেড়াতে যাও তাহলে অবশ্যই তোমার বিছানা-পত্র সঙ্গে করে নিয়ে যাও।
- রোগ-ব্যাধি ছাড়া যতটা সম্ভব তুমি এরূপ আপত্তি করবে না যে, আমি অমুক জিনিষ খাই না। কেননা, মানুষের সব সময় এক রকম অতিবাহিত হয় না।
- যদি তুমি কারও নিকট মেহমান হতে চাও তাহলে পূর্বাহ্নেই সংবাদ দাও।
- যদি তোমার নিকট কোন মেহমান আসে তাহলে সর্বপ্রথম তুমি তার শোয়ার স্থান করে দাও এবং তাকে পায়খানা দেখিয়ে দাও।
- যদি তুমি কারও নিকট মেহমান হয়ে যাও তাহলে যাওয়ার পরই তুমি আনুমানিক কতদিন থাকবে তা তাকে জানিয়ে দাও।
- তুমি ভ্রমণের সময়ে তোমার জিনিষ-পত্র সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ো না।
- পারতপক্ষে তুমি একাকী সফরে যেয়ো না বরং কাউকে তোমার সঙ্গী বানিয়ে নাও।
- যতদূর সম্ভব তুমি এমন স্থানে মেহমান হয়ে যেও না যেখানে অতিথিসেবক অথবা তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি অসুস্থ।
- যতদূর সম্ভব তুমি 'তুই-তোকারী' বলে কথা বলো না।
- যতদূর সম্ভব তুমি তোমার অতিথিসেবকের নিকট অসময়ে যাবে না।
- যখন তুমি সফরে যাও তখন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে যাও।
- যদি কোন দুর্বল ভ্রমণকারী বাস বা ট্রেনে স্থান না পায় তাহলে তাকে সাহায্য করো।
- তুমি আয়না ব্যবহার করার পরে সর্বদা উহাকে যথাস্থানে রেখে দাও।
- তুমি মজলিসে তোমার পা ছড়িয়ে বসবে না।
- তুমি ধার করে বা ছিন্ন কাপড় পড়ে বাইরে বের হয়ো না।
- তুমি বাইরে বেরোবার পূর্বে সাধারণতঃ আয়না দেখে নাও।
- তুমি তোমার জামার বুতাম খুলে বাজারে যেও না।
- তুমি ঘরের দরজা ও জানালাগুলোকে আস্তে বন্ধ করো যাতে অন্য লোকদের ( উহার শব্দে ) কষ্ট না হয়।

(চলবে)

# বুলন্দ হিম্মতি

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

( ১১-১৩ বছর বয়স্ক ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের
পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত )

ম্যায় আপনে পেয়ারোঁ কি নিসবত
হারগিয না করুঙ্গাঁ পসন্দ কভী
উওহ্ ছোটে দরজা পে রাযী হোঁ
আওর উন কি নিগাহ্ রাহে নীচী
উওহ্ ছোটি ছোটি বাতোঁ পার
শেরোঁ কি তারাহ্ গর্রাতে হোঁ
আদ্না সা কসূর আগার দেখেঁ
তো মুহ্ মে কাফ্ ভর লাতে হোঁ
উওহ্ ছোটি ছোটি চিযোঁ পার
উম্মিদ লাগায়ে বয়ঠে হোঁ
উওহ্ আদনা আদনা খাওয়াহেশ কো
মকসূদ বানায়ে বয়ঠে হোঁ
শামশীরে যবাঁ সে ঘর বয়ঠে
দুশমন কো মারে জাতে হোঁ
ময়দানে 'আমল কা নাম ভী লো
তো ঝিঁপতে হোঁ ঘাবরাতে হোঁ
গিডর কি তারাহ্ উওহ্ তাক্ মে হোঁ
শেরোঁ কে শিকার পে জানে কি
আওর বয়ঠে খাওয়াবেঁ দেখতে হোঁ
উওহ্ উন কা জুঠা খানে কি
আয়ে মেরি উলফৎ কে ত্বালেব !
ইয়ে মেরে দেল কা নক্শা হ্যায়
আব আপনে নফস্ কো দেখ্লে তু
উওহ্ ইন বাতোঁ মেঁ কেয়সা হ্যায়
গার তেরি হিম্মত ছোটি হ্যায়

গার তেরে এরাদে মুর্দা হ্যায়।
গার তেরি উমঙ্গে কোতা হ্যাঁয়
গার তেরে খেয়াল আফসুরদাহ্ হ্যায়
কেয়া তেরে সাথ লাগা কার দেল
ম্যা খোদ ভী কমীনা বন জাউঁ
হেঁা জান্নাত কা মীনার, মাগার
দোযখ কা যীনা বন জাউ
হ্যায় খাওয়াহেশ মেরি উলফৎ কি
তু আপনি নিগাহেঁ উঁচি কার
তদবীর কে জালেঁা মেঁ মাত ফাঁস
কার কবযা জা কে মোকাদ্দর পর
ম্যাঁ ওয়াহেদ কা হেঁা দিলদাদাহ্
আওর ওয়াহেদ মেরা পেয়ারা হ্যায়
গার তু ভী ওয়াহেদ বন জায়ে
তু মেরি আখ কা তারা হ্যায়
তু এক হো সারি দুনিয়া মেঁ
কোই সাঝি আওর শরীক না হো
তু সব দুনিয়া কো দে লেকিন
খোদ তেরে হাত মেঁ ভিক না হো

( কালামে মাহমুদ )

# অদম্য সাহসী

আমি আমার প্রিয়দের সম্বন্ধে
অবশ্যই কখনও পসন্দ করবো না,
তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মর্যাদায় সন্তুষ্ট হয়
আর তাদের দৃষ্টি থাকে নিম্নমুখী।
তারা সামান্য সামান্য কথায়
বাঘের ন্যায় গর্জন করে,
সামান্য ত্রুটি যদি দেখে
তাহলে ( রাগে ) মুখে ফেনা নির্গত করে।
তারা ছোট ছোট জিনিসের ওপরে
আশা করে বসে থাকে।

তারা সামান্য আশা-আকাঙ্খাকে
(জীবনের) উদ্দেশ্য বানিয়ে বসে থাকে।
কথার তরবারী দ্বারা ঘরে বসে
শত্রুকে বধ করতে থাকে।
কর্মে-ক্ষেত্রের নামও যদি নেয়া হয়
তাহলে কাতর হয়—বিচলিত হয়।
শৃগালের মত তারা তাক্ করে থাকে
ব্যাঘ্রদের শিকারের অন্বেষণে যাওয়ার।
আর বসে বসে স্বপ্ন দেখে
তারা উহাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়ার।
হে আমার স্নেহের প্রত্যাশী!
ইহা মোর হৃদয়ের চিত্র।
এখন নিজের সত্তাকে পরখ করে নাও তুমি
উহা এসব বিষয়ে কি অবস্থায় আছে।
যদি তোমার সাহস ক্ষীণ হয়
যদি তোমার আকাঙ্খা হয় মৃত,
যদি তোমার উচ্চাশা হয় ক্ষীণ
যদি তোমার ধ্যান-ধারণা হয় উদাসীন,
তোমার সাথে প্রাণ দিয়ে কি
আমি নিজেই হীনমন্যে পরিণত হবো?
বেহেশ্তের মিনার হয়ে কি
দোযখের সোপানে পরিণত হবো?
যদি আমার স্নেহের প্রত্যাশা করো
তাহলে নিজের দৃষ্টিকে সমুন্নত করো।
তদবীরের (চেষ্টা-প্রচেষ্টা) জালসমূহে আবদ্ধ হয়ো না
তকদীরের (নিয়তি) ওপরে নিয়ন্ত্রণ লাভ করো।
আমি হলেম এক-অদ্বিতীয় খোদার প্রেমিক
আর তিনি-ই মোর আদরের ধন।
যদি তুমিও খোদার সেই ওয়াহেদ গুণে গুণান্বিত হয়ে যাও
(তাহলে) তুমি মোর চোখের মণি।
সারা দুনিয়াতে (যদি) তুমি একাই হও
কোন সাথী ও অংশী তোমার না-ও থাকে।
তুমি সারা দুনিয়াকে দান করো, কিন্তু
স্বয়ং তোমার হাত যেন ভিক্ষা-মুক্ত থাকে

অনুবাদ: মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

# সংবাদ

## সীরাতুন্নবী ( সাঃ ) জলসা অনুষ্ঠিত

০ গত ১৮ জুলাই রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ এই প্রথম সরিষাবাড়ী জামাতের বলার দিয়ার মসজিদে সাফল্যজনকভাবে সীরাতুন্নবী ( সাঃ ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০ জন আনসার ২০ জন খোদ্দাম ১০ জন আতফাল ১০ জন লাজনা ও ৫ জন গয়ের আহমদী ভ্রাতাসহ প্রায় ৬০ জনের মত লোক অংশগ্রহণ করেন।

০ অদ্য ১৫-৮-৯৭ ইং বাদ জুমুআ আঃ মুঃ জাঃ চুয়াডাঙ্গার উদ্যোগে মহান সীরাতুন্নবী ( সাঃ ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন পুরুষ এবং পরদার আড়ালে ছিলেন কিছু লাজনা সদস্যাবৃন্দ।

০ নিম্নলিখিত মজলিসগুলিতে আগষ্ট মাসব্যাপী স্থানীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর ইজতেমা '৯৭ অত্যন্ত সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছে :

কুমিল্লা, বি বাড়ীয়া, ঘাটুরা, সরাইল, নাটাই, শালগাঁও, তারুয়া, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দুর্গারামপুর, বাশারুক, শাহাবাজপুর, ক্রোড়া, জামালপুর, চানপুর চাবাগান, চণ্ডীছড়া ও ঘড়িলাল।


## জরুরী নিযুক্তি

একটি প্রতিষ্ঠিত কুরিয়ার সার্ভিসের জন্য কিছু সংখ্যক ডেলিভারীম্যান পদে অতি জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। বেশ কয়েকজনকে অপেক্ষামান তালিকায় রাখা হবে।

**যোগ্যতা ঃ**

১। এস, এস, সি ২য় বিভাগে পাশ, অভিজ্ঞদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

২। ঠিকানা ইংরেজীতে পড়তে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে।

৩। ঢাকায় যারা থাকেন বা ঢাকা শহরের রাস্তা চেনেন তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৪। তালীম ও তরবীয়ত প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার থাকবে।

৫। বুদ্ধিদীপ্ত/চটপটে ও আত্ম বিশ্বাসী হওয়া খুবই প্রয়োজন।

৬। স্থানীয় কায়েদ/প্রেসিডেন্টের সুপারিশ পত্র।

দরখাস্ত সহ উপস্থিত হওয়ার তারিখ—৩০/৯, ১/১০ ও ২/১০/৯৭।
সাক্ষাতকারের জন্য কোন টি, এ/ডি, এ দেয়া হবে না।

**ইউনিয়ন কুরিয়ার সার্ভিস**

দোতলা, ৩২, ডি, আই, টি এক্সটেনশন রোড, নয়া পল্টন, ( মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা সংলগ্ন ) ঢাকা-১০০০। ফোন—৯৩৪১৭২২, ফ্যাক্স-৮৮-০২-৮৩১৫১৭

# আসহাবে কাহাফের পাতা

## আবদুর রকীম

প্রশ্নঃ অবিভক্ত বাংলার প্রথম দুই আমীর সম্বন্ধে বলুন। এরা কি আমরণ আমীর ছিলেন ?

(১) উত্তরঃ ১৮৫৩ সালে অধুনা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নাসির নগর থানার অন্তর্গত নাসিরপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পীর পরিবারে সৈয়্যদ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়্যদ আব্দুল গফফার প্রকাশ হাজী জোয়াদ উল্লাহ। তিনি কলিকাতায় এবং পরে লক্ষ্ণৌতে মৌলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভির কাছে দশ বৎসর শিক্ষা লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব পদে নিযুক্ত হন। তিনি কাযী এবং মুফতী পদেও অধিষ্ঠিত হন। স্থানীয় অন্নদা হাই স্কুলের হেড মৌলানারূপেও তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। এজন্য লোকে তাঁকে বড় মৌলানা সাহেব বলে ডাকত। তাঁর বহু মুরিদান ছিল। তিনি আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদের (আঃ) সঙ্গে ১৯০২ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত পত্রালাপ করেন। অবশেষে সত্যের সন্ধানে তিনি লক্ষ্ণৌ, বেরেলী, শাহজাহান পুর, দিল্লী, অমৃতসর, বাটালা প্রভৃতি স্থান সফর করে প্রখ্যাত আলেমদের সঙ্গে আলোচনা করে কাদিয়ান পৌঁছেন। ১৯১২ সালে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়ালের (রাঃ) হাতে নভেম্বর মাসে বয়াত গ্রহণ করেন। এই সফরে পুনিওটের মৌলবী এমদাদ আলী, বড় হরনের কারী দেলওয়ার আলী এবং ধানু মুন্সী সঙ্গী ছিলেন। এরা সবাই ৯ দিন বাদে জুমুআয় বয়েত গ্রহণ করেন। মৌলানা সাহেবের তবলীগে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এলাকায় দুই হাজারেরও বেশী লোক আহমদীয়ত কবুল করেন। যুগ-খলীফা তাঁকে দস্তি বয়াত অর্থাৎ নিজ হস্তে বয়াত গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেন। ১৯১৩ সালে খড়মপুর খাদেম পরিবারের যুবক গোলাম মওলা খাদেম সাহেব কাদিয়ানে গিয়ে বয়াত করেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এলাকায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চৌধুরী মুজাফফর উদ্দীন, দৌলত আহমদ খান খাদিম, গোলাম সামদানী খাদিম, সুফী মতিউর রহমান, মৌলানা জিল্লুর রহমান প্রমুখ বয়াত গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে চৌধুরী মুজাফফর উদ্দীন সাহেব জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী

এবং মোবাল্লেগরূপে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। গোলাম সামদানী খাদিম সাহেব (উকিল) ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জেলা আমীর এবং আহমদী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। সুফী মতিউর রহমান এম,এ, আমেরিকায় ২৭ বৎসর কাল মোবাল্লেগ ছিলেন। মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বাংলার মোবাল্লেগরূপে দীর্ঘ কাল কাজ করে গেছেন। দৌলত আহমদ খান খাদেম উকিল সাহেবও জামাতের বহু খেদমত করে গেছেন। মৌলানা সাহেবের "হাদীসুল মাহদী" এবং খাদেম সাহেবের "সেকালের তরুণ মোসলেম" (অনুবাদ) দু'টি খুবই মূল্যবান পুস্তকরূপে সমাদৃত। ১৯১৩ সালে খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ) মৌলানা সৈয়্যদ সারওয়ার শাহ সাহেবকে আমীর করে মৌলানা গোলাম রসুল রাজেকী, মীর কাশেম আলী, মৌঃ আবু ইউসুফ এবং মৌঃ মোবারক আলী শিয়ালকুটিকে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। এরা সবাই মসীহে মাওউদের (আঃ) সাহাবী ছিলেন (রাযিঃ)। ১৯১৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় জামাত গঠিত হলেও ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালে। হযরত মৌলানা সাহেব আমীর মনোনীত হন। তিনি আহমদীদের কাছ থেকে প্রথম দিকে চাঁদা আদায় করতেন না। তাঁর ভয় ছিল এর ফলে লোকেরা মনে করবে যে, তিনি তাঁর পীরালী ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে মোবাল্লেগরূপেও মনোনয়ন দেয়া হয়। তিনি ১৯২৬ সালের ১৮ ই মার্চ ৭২ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কবর তাঁর নিজ বাড়ীতে (মৌলবী পাড়ায়) অবস্থিত। যদিও তিনি মুসী ছিলেন না তবুও তাঁর অবদানের জন্য বেহেশ্‌তি মকবেরাতেও তাঁর নাম ফলক খচিত আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতই বাংলার প্রথম জামাত। এই জামাতের কেন্দ্র ছিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের মৌলবী পাড়ায়। এর নাম ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া। সেখানে ১৯১৭ সালে প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী এবং ডিপুটি হুস্‌সাম উদ্দীন হায়দার সাহেবের অবদানই ছিল বেশী। আহমদী দের জন্য নির্দ্ধারিত চাঁদার পরিবর্তে মসজিদে একটি বাক্স রাখা হয়েছিল যার মধ্যে যার যা খুশী মত পয়সা দান করতেন। সর্ব প্রথম বাংলদেশ থেকে কাদিয়ানে যে চাঁদা প্রেরিত হয় তার পরিমাণ ছিল ৭৫ টাকা মাত্র।

১৯১৬ সালে বাশারুক গ্রামের উনিশ বৎসর বয়স্ক যুবক রহমত আলী বয়াত গ্রহণ করে কাদিয়ানে চলে যান। তিনি ১৯২২ এবং ২৩ সালে মালকানায় শুদ্ধি আন্দোলনের মোকাবেলা করেন। ১৯৬০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে সমাহিত হন।

হযরত বড় মৌলানা সাহেব বাংলা, উর্দু এবং ফার্সী ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। তিনি কয়েকটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

( ২ ) প্রফেসার আব্দুল লতীফ খান সাহেব অনুমান ১৮৮০ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার লোক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মামার আশ্রয়ে থেকে তিনি ফাইনেল মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করেন। পরে ইসলামীয়া হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীনে টাইটেল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। কলিকাতায় তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর লিখিত পুস্তকের মধ্যে Anglo Arabic Primer এবং Elementary Anglo Arabic Grammers অন্যতম। তিনি ১৯০৮ সালে চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজে আরবী ও ফার্সীর প্রফেসর নিযুক্ত হন।

তিনি খান সাহেব মোবারক আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়তের পয়গাম লাভ করেন। ঐ সময় খান সাহেব মোবারক আলী সাহেব চট্টগ্রামে হেড মাষ্টাররূপে কার্যরত ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে তবলীগ করতেন। ঐ সময় মৌলানা হাকিম খলীল আহমদ মুঙ্গেরী কাদিয়ান থেকে চট্টগ্রাম আসেন। তাঁর সঙ্গে বহস করার জন্য প্রফেসার আব্দুল লতীফ সাহেব বড় বড় কিতাব নিয়ে আসেন। আলোচনা হচ্ছিল উকিল আব্দুস সাত্তার সাহেবের বাসায়। মুঙ্গেরী সাহেবের বক্তব্য শ্রবণ করে প্রফেসর সাহেব তাঁর কিতাবের বস্তা নিয়ে চলে যান এবং বলেন যে, তাঁর সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা মৌলানা মুঙ্গেরী সাহেবের বক্তব্যের দ্বারাই হয়ে গেছে। অতএব, বহসের আর প্রয়োজন নেই। খলীল আহমদ মুঙ্গেরী সাহেব চারদিন পর্যন্ত বক্তব্য রেখেছিলেন। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন শামসুল ওলামা কামাল উদ্দীন সাহেব। ইনি ক্যামব্রিজের গ্রাজুয়েট ছিলেন এবং আরবী ভাষার গবেষক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবাব আব্দুল লতীফ সাহেবের জামাতাও ছিলেন। খান সাহেব মোবারক আলী সাহেবের তবলীগে তিনি আহমদীয়তের সত্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু বয়াত গ্রহণ করার সাহস ছিল না। তাঁর ছত্রছায়ায় প্রায়ই আহমদীয়ত নিয়ে বৈঠক বসত। তিনি এই আলোচনা সভাকে 'কাদিয়ানী ইভেনিং' বলতেন। তিনি বলতেন, 'আমি আহমদীদের জন্য আবুতালেব সদৃশ।'

এদিকে প্রফেসর সাহেব কাদিয়ান থেকে মসীহে মাওউদের ( আঃ ) কিতাবাদি আনিয়ে পাঠ করতে লাগলেন। একবার আন্দরকিল্লা মসজিদে বৈঠক হয়। মৌলানা মুঙ্গেরী সাহেব তাতে বক্তব্য রাখেন। এতে মোল্লারা তর্ক-বিতর্ক এবং হৈ চৈ শুরু করলে মৌলানা সাহেব ঐ মসজিদ থেকে চলে আসেন। প্রফেসর সাহেব মসীহে মাওউদের ( আঃ ) কিতাবসমূহ পাঠ করে বয়াত করতে মনস্থ করেন এবং বয়াত ফরম পূরণ করে ডাকে দিতে যান, কিন্তু

ডাকে না দিয়ে ফিরে আসেন। তিনি ওলী খাঁ মসজিদে ইমামতি করতেন। একদিন ফজরের নামাযের পর দোয়া করে তাক থেকে পবিত্র কুরআন নিয়ে বলেন যে, তিনি কুরআনের যে কোন পৃষ্ঠায় আল্লাহ্‌র যে নির্দেশ পাঠ করবেন তদনুযায়ী তিনি আমল করবেন। এই বলে দোয়া করে তিনি কুরআন উন্মুক্ত করলেন। তখন দেখতে পেলেন তাতে লেখা রয়েছে,— ইয়া কাউমানা আজিবুদায়ী আল্লাহে ওয়া আমিনু—'হে আমার জাতি, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান-কারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং ঈমান আন!' এরপর তিনি আর দেরী না করে বয়াত নামা ডাকে (১৯১৬ সালে) দিলেন। তাঁর আহমদীয়ত গ্রহণের পর চরম মোখালিফাত শুরু হল। তিনি খলীফাতুল মসীহের কাছে এ ব্যাপারে পত্র দিলেন। হুযুর (রাঃ) মৌলানা সরওয়ার শাহ সাহেব, মৌলানা আবদুর রহমান মিশ্রী এবং চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাই-য়ালকে চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের আগমনে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। তাঁদেরকে থাকতে দেয়া হয়েছিল ইসলামীয়া বোর্ডিং এর লাইব্রেরী ঘরে। ঘরটি ছিল ছনের। রাতে বিরুদ্ধবাদীরা ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার এমদাদ আলী চৌধুরী সাহেব নিজের জীবন বিপন্ন করে আগুন নিভিয়ে ফেলেন। তবে এতে তাঁর দু'টি হাতই পুড়ে যায়। এমমদাদ আলী সাহেব মৌলানা সাহেবদের আগমনের সংবাদ পেয়ে খেদমতের জন্য বিবির গয়না বন্ধক রেখে রাহ খরচ নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন। খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরীও ঐ সময় চট্টগ্রাম আসেন এবং মৌলানা সাহেবেরা যতদিন চট্টগ্রামে ছিলেন ততদিন তিনিও চট্টগ্রামে থাকেন। মৌলানা সৈয়াদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের মৃত্যুর (১৯২৬ সালে) পর প্রফেসর আবদুল লতীফ খান সাহেব বাংলার আমীর নিযুক্ত হন এবং ১৯৩১ সালের শেষ দিকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। তাঁর মাজার তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মসজিদের আঙ্গিণায় অবস্থিত।

---

## শোক সংবাদ

মোসাম্মাৎ জেলাতুন্নেসা, স্বামী মরহুম শমশের আলী খান, গ্রাম দুর্গাতিয়াপাড়া গত ৩/৬/৯৭ইং তারিখে বিকাল ৪-১৫ মিঃ ইন্তেকাল করেন, (ইন্না .....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর। মরহুমার প্রথম ছেলে ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম ফারুক খান ও স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ আহমদীয়া মুসলিম জামাতে ১৯৯০ইং সালে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বয়াত গ্রহণ করেছিলেন। মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম ফারুক
কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ

# হোমিওপ্যাথি—সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' ( আই: )

( দ্বিতীয় কিস্তি )

হোমিওপ্যাথি ঔষধের ব্যবহার যে একেবারেই নিরাপদ এ ধারণা সঠিক নয়। এটির উপমা বর্তমান যুগের মোটর গাড়ীর মত। আধুনিক মোটরগাড়ী বেশ নিরাপদ একটি বাহন। কিন্তু অপারদর্শী বা অজ্ঞ চালকের হাতে পড়লে এটি আর নিরাপদ থাকে না। তাই হোমিও ঔষধ কেবল এই অর্থে নিরাপদ যে রোগ-ব্যাধির সঠিক সনাক্তকরণের পর যদি সঠিক ঔষধ বেশী মাত্রায়ও ব্যবহৃত হয় তবু এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া নেই। অথচ এলোপ্যাথিক ঔষধ যদি যোগ্য ও নিরাপদ হাতেও ব্যবহৃত হয় এর মাঝে ক্ষতিকর দিক বিদ্যমান। যেমন ধরা যাক এসপিরিনের কথা। মাথাধরা প্রভৃতি রোগ দূর করার জন্য সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি যদি নিয়মিত আর ক্রমাগত সেবন করা হয় তাহলে এ থেকে পেটের অভ্যন্তরীণ ঝিল্লি এবং লিভারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে এলোপ্যাথিক চিকিৎসক যতই বিচক্ষণ হোন না কেন এটি তাদের অপারগতা বিশেষ। এলোপ্যাথিক ঔষধ একটি ব্যাধি দূর করলেও আরেক ব্যাধি উৎপন্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হোমিও-প্যাথিক ঔষধের নিরাপদ হওয়াটা হোমিও চিকিৎসকদের উপর নির্ভরশীল। যদি এদের রোগ চিহ্নিত করা সঠিক হয়ে থাকে তবে ঔষধ পরিমাণে একটু বেশী হলেও তা ক্ষতির কারণ হয় না।

হোমিও ঔষধের বিবিধ প্রভাব ও গুণাগুণ জানার পদ্ধতিকে লক্ষণ-পরীক্ষণ বা প্রুভিং ( Proving ) বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার ঔষধের বিশেষত্ব জানার একটি পন্থা হলো হাজার হাজার বছরের বিস্তৃত মানব-অভিজ্ঞতা। মানুষ নানাভাবে বিভিন্ন বিষ ব্যবহার করে এসেছে যার মাধ্যমে এদের বিশেষত্ব আর প্রভাব জানা গেছে। দার্শনিক সক্রেটিসকে কোনিয়াম ( Conium ) নামক একটি বিষ দেয়া হয়েছিল। তিনি বড় ধরনের একজন চিকিৎসকও ছিলেন। মৃত্যুকালেও তিনি মানব-সেবা করে গেছেন। তাঁর শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হলে তিনি তাঁর শিষ্যদের ক্রমাগত-ভাবে এই বিষের প্রভাব ধারাবাহিক বর্ণনা আকারে বলে যান। একইভাবে আরও নানা ঐতিহাসিক ঘটনা আর অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বিষের গুণাগুণ সম্বন্ধে জানতে পেরেছে। ডাক্তার হ্যানিম্যান জানতে পারলেন যদি কোনো বিষ অতি স্বল্প মাত্রায় বার বার প্রয়োগ করা হয় এতে শরীর প্রভাবিত হয় ঠিকই তবে এতে শরীর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। এই প্রক্রিয়াকে নিয়মিত চালু না রাখলেই হলো। ডাক্তার হ্যানিম্যান রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মানুষের মানসিক লক্ষণসমূহের উপর সবচাইতে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন। যদি কোনো বিষ প্রয়োগে এমন সব মানসিক

লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয় যা একজন রুগীর দৃশ্যতঃ মানসিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ তাহলে সেই বিষটিই হোমিওপ্যাথিক পন্থায় ঔষধ আকারে প্রয়োগ করলে উপকার হবে।

**হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সেবন মাত্রা ঃ**

কত শক্তির ঔষধ কোন্ ব্যাধিতে প্রয়োগ করতে হয় এ বিষয়ে পৃথিবীর হোমিও চিকিৎসকরা একমত হতে পারেন নি। সবাই নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ঔষধের শক্তি নির্দিষ্ট করে থাকেন। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় যে, ৩০ (ত্রিশ) শক্তির ঔষধ দৈনিক দু'তিনবার অথবা এর চেয়েও অধিকবার প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে কোনো ক্ষতি হয় না। ৩০ পটেন্সিকে মধ্যম শক্তিসম্পন্ন ঔষধ বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু হোমিওপ্যাথি প্রণালীতে ঔষধ বড়ই সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করা হয় বরং বলতে গেলে মূল ঔষধের একটি প্রচ্ছায়াই এতে অবশিষ্ট থাকে। তাই যদি পরিমাণে বেশীও সেবন করা হয়, স্বল্প পরিমাণে কিম্বা বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করলে কিছু যায় আসে না। এতই সামান্য এর ব্যবধান যে ৫০টি বড়ি (গ্লোবিউলস্) খেলেও যা কয়েকটি খেলেও তাই ; বাস্তবে কোনো তফাৎ নেই। তবে কতবার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে—এটি অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। হোমিও ঔষধ মুখে দেয়ার সাথে সাথেই কাজ আরম্ভ করে দেয়। আর যতবার প্রয়োগ করা হবে ততবারই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পানিতে এক ফোটা নাকি দশ ফোটা ঔষধ মেশানো হলো এতে কিছু যায় আসে না। ঔষধের ক্রিয়া মুখে যেতেই আরম্ভ হয়ে যায়। রক্ত কণিকা মুখ থেকে ঔষধের প্রভাব গ্রহণ ক'রে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। ঔষধের বড়ি গণনা করে করে মুখে দিয়ে কোনো লাভ নেই। কিছু সংখ্যক হোমিও চিকিৎসক জোর দিয়ে বলেন যে, হাতের পরিবর্তে ঔষধ অবশ্যই কাগজে নিয়ে মুখে দিতে হবে তা না হলে ঔষধের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ সাধারণতঃ মুখের অভ্যন্তরের চেয়ে আমাদের হাত বেশী পরিস্কার থাকে। মুখের ভেতর অনেক ধরনের নোংরা বা ময়লার স্তর জমে থাকে। এতদ্ সত্ত্বেও যদি সেটা ঔষধের প্রভাব গ্রহণ করতে পারে তাহলে হাতে নিয়ে খেলে অসুবিধা কোথায়? যদি কাগজে নিয়েই খেতে হয় তাহলে প্রশ্ন জাগে, কাগজের মধ্যেও অনেক ধরনের ময়লা থাকে, নানা প্রকারের রাসায়নিক প্রভাবও এর মাঝে বিদ্যমান। আবার লক্ষ্য করুন সাধারণ খাবার লবণকে হোমিও পদ্ধতির ঔষধ বানালে নেট্রাম মিউর বলা হয়। মুখ গহ্বরে পূর্ব থেকেই এত লবণ বিদ্যমান যে সেই মুখে নেট্রাম মিউর সেবনের অর্থ হলো লবণের খনিতে যেন কেউ এক কোটা পানি ঢেলেছে!

এতদ্‌ত্বেও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হলো হোমিও ঔষধের প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থাপনা ভিন্ন ধরনের। ঔষধ প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় যখন মূল ঔষধকে সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ করা হয় তখন স্মৃতি বা ছাপের এমন কোনো শক্তি অবশিষ্ট থেকে যায় যা রক্তে মিশে নিজের প্রভাব অবশ্যই প্রদর্শন করে আর মানবদেহ এর প্রভাব অবশ্যই গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃত বিষয়টি কি? এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা স্মরণ রাখার এমন একটি ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেছেন যে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। আল্লাহ্‌তা'লা যখন চান সেই স্মৃতিকে পুনরায় জাগ্রত করতে পারেন। এটা একটি আত্মিক ব্যবস্থাপনা তবে একটা জড়বস্তুর সাথে এর একটা সম্পর্ক বিদ্যমান। এ পদ্ধতিতে তাই জড়বস্তুর মাধ্যমে দেহকে এক ধরনের আত্মিক আরোগ্যের বার্তা প্রদান করা হয়।

## ঔষধ কখন সেবন করা উচিত:

ঔষধ সেবন করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যেন আহার করার অনতিপূর্বে কিংবা অনতিপর ঔষধ সেবন করা উচিত নয় অর্থাৎ আহার গ্রহণের আধা ঘন্টা পূর্বে এবং আধা ঘন্টা পর পর্যন্ত ঔষধ না খাওয়া উত্তম। এই বিরতির মধ্যে ঔষধ সেবন করলে ঔষধ কার্যকর হয় ঠিকই তবে প্রভাব কম হয়। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে বিরতির সময়ে খেলেও কোনো অসুবিধা নেই। ভোর বেলা খালি পেটে কিংবা রাতে যে ঔষধ সেবন করা হয় তার প্রভাব বেশী হয়।

## ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী

হোমিওপ্যথি ঔষধের মূল অংশকে এলকোহলে মিশিয়ে কিছু সময় রাখা হয় এরপর একে ছেঁকে নেওয়া হয়। এই প্রাথমিক অবস্থাকে পোটেন্‌সি বলা হয় না, এই মিশ্রণকে 'মাদারটিংচার' বলে। অনেক ব্যাধিতে মাদারটিংচারই ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন লিভার এর ব্যাধিতে কারডুয়াস মেরিনাস (Carduus Marianus) ব্যবহৃত হয় যার সাথে ইংরেজী 'Q' অক্ষরটি লিখা হয়। 'Q' অক্ষরটি মাদার টিংচার এর চিহ্ন। এই ঔষধকে ৮/১০ ফোঁটা পানিতে মিশিয়ে খাওয়ালে লিভারের (যকৃত) অনেক ব্যাধিতে উপকারিতা লাভ হয়। এই টিংচারের এক ফোটা ঔষধ দশ ফোঁটা এলকোহল কিংবা পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে ঝাঁকানো হয়। এই প্রথম দ্রবণকে '1X' বলা হয়। পরবর্তীতে এর থেকে ১ ফোঁটা নিয়ে সেটাকে দশ ফোঁটা এলকোহলে মেশানো হয়। এই পন্থায় ছয়বার করলে মূল ঔষধের প্রথম ফোঁটার দশ লাখের ১ ভাগ অবশিষ্ট থাকে। একে '6X' শক্তিধর ঔষধ বলা হয়। যদি

চব্বিশ বার ( ২৪ ) উক্ত প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে
১
মাদার টিংচারের এক ফোঁটার ১ ( ডানে ২৪টা শূন্য )। এমন কোন গণনা পদ্ধতি নাই যাতে এই সংখ্যার নামকরণ করা যেতে পারে। এত বৃহৎ সংখ্যার নামকরণ জগতের কোন গণনা শাস্ত্রের আলোকেই করা সম্ভব নয়। ঔষধ প্রস্তুতের উক্ত প্রণালীকে 'ডেসিমেল পদ্ধতি' বলা হয়। যদি মূল ঔষধের ফোঁটার সাথে একশ ফোঁটা এলকোহল মিশিয়ে দ্রবণ তৈরী করে এই প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত করা হয় তাহলে প্রস্তুতকৃত ঔষধের সাথে 'C' অক্ষর লেখা থাকে যা শতকের নির্দেশক। এরপরে এই দ্রবণের এক ফোঁটা ঔষধ নিয়ে একই প্রক্রিয়ায় ঔষধের শক্তি আরো বৃদ্ধি করা হয়।

আমরা যখন ঔষধের শক্তি বৃদ্ধির কথা বলি তখন কিন্তু বিষের শক্তি বৃদ্ধির কথা বলি না বরং শরীরের রোগ প্রতিরোধ প্রদর্শন ক্ষমতার আলোকে বলি। এক হাজার শক্তির ঔষধের অর্থ হলো ঔষধ এত স্বল্প মাত্রায় দ্রবণে অবশিষ্ট যে শরীরের উপর নিজের প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই অক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পাবে ততই এর বিপরীতে প্রভাব প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাই একে পোটেন্সি ( potency ) বলা হয় অর্থাৎ মানবদেহের শক্তি। যদি ঔষধের শক্তির সাথে 'c' লেখা থাকে তবে এর অর্থ হলো শতাংশ প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত করা হয়েছে। সাধারণতঃ 'c' লেখার নিয়ম নেই বরং 1, 2, 3 একইভাবে 3o ইত্যাদি লেখা থাকে। 'c' লেখা থাকলে শতাংশ পদ্ধতিতে যে ঔষধ প্রস্তুত হয়েছে এটি নিশ্চিত। যেহেতু পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতে ঔষধ প্রস্তুত করা সর্বাধিক প্রচলিত তাই পৃথকভাবে 'C' লেখার প্রয়োজন নেই। ঔষধ এক হাজার ( ১০০০ ) শক্তিসম্পন্ন হলে 1M বলা হয়। 10M এর ঔষধ বলতে ১০ হাজার শক্তির ঔষধ বুঝায়। যদি এক লক্ষ পটেন্সির ঔষধ প্রস্তুত করা হয় অর্থাৎ মূল ঔষধকে দুর্বল করে
১
১ ( ডানে ছ'লক্ষ শূন্য ) ভাগ করে দেয়া হয় তাহলে একে CM বলা হয়। রোমীয় গণনা পদ্ধতিতে 'M' হাজারের পরিচায়ক এবং 'C' শতক নির্দেশক। যখন CM একত্রে লেখা হয় এর অর্থ হবে এক লক্ষ শক্তি বা পটেন্সি।

ঔষধ প্রস্তুতির দ্বিতীয় পদ্ধতি দাঁড়ালো, মূল দ্রবণ বা ঔষধের এক ফোঁটা ১০০ ( একশ ) ফোঁটা এলকোহলে মিশ্রিত করে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে তবে এতে 1C ঔষধ প্রস্তুত হবে। এভাবে 1C থেকে এক ফোঁটা ঔষধ নিয়ে পুনরায় একশ

ফোঁটা এলকোহলে মিশিয়ে ভালভাবে ঝাঁকালে 2C ঔষধ প্রস্তুত হবে। এ প্রক্রিয়ায় করতে থাকলে ঔষধের শক্তি বাড়তে থাকবে।

## হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিকের তফাৎ

বায়োকেমিকের অপর নাম 12 Tissue Remedies.। মানবদেহে রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থায় আরেকটি ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান যাকে ইলেকট্রোলাইট বলে। এই ব্যবস্থা শরীরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনাকে ভারসাম্যপূর্ণ সুসমন্বিত রাখে। যদি এই ব্যবস্থা সুসমন্বিত থাকে তাহলে দেহও স্বাস্থ্যবান থাকে। এই বারোটি টিস্যু যে সব খনিজ উপকরণ বা কেমিক্যাল থেকে তৈরী সে সব উপকরণ দিয়ে যে হোমিও ঔষধ প্রস্তুত করা হয় তাকে বায়োকেমিক বলা হয়। 'Bio' শব্দের অর্থ জীবন আর Chemic শব্দটি Chemical এর শব্দ সংক্ষেপ। অর্থ দাঁড়ালো এগুলি সেই কেমিক্যাল যা জীবন প্রস্তুত করে বা যেগুলি জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক। এদের পরস্পর ভারসাম্যহানী ঘটলে অতীব গভীর রোগব্যাধি দেখা দেয়। রোগব্যাধির প্রারম্ভে অথবা সাধারণ অসুখ-বিসুখেও ইলেকট্রোলাইট ব্যবস্থা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। তাই এই ঔষধগুলি সাধারণতঃ উক্ত ব্যবস্থাকে সঠিক করার পর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে পুনর্জীবিত করে। আল্লাহ্‌র কৃপায় এগুলো বিশেষ উপকারী। এদের মধ্যে একটি ঔষধের নাম সাইলেসিয়া ( আরেকটি উচ্চারণ সিলিসিয়া, ইংরেজীতে Silicea )। এটি কেমিক্যাল নয় বরং সিলিকন থেকে এটি প্রস্তুত যা মাটির একটি মৌলিক উপাদান আর সব মাটিতেই বিদ্যমান। সিলিকন জীবন সৃষ্টির উপাদানসমূহের মাঝে অন্যতম একটি উপাদান। মানবদেহে এর প্রভাব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেহকে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে সচেতন ও সজাগ করার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এটি হোমিওপ্যাথি ব্যবস্থায় বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত ঔষধসমূহের মধ্যে সবচে' কার্যকর। বাইরের কোন বস্তু যদি শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহলে সাইলেসিয়া দেহের ঐ সমস্ত প্রতিরোধ শক্তিকে জাগ্রত করে দেয় যারা এটিকে বাইরে নিক্ষেপ করতে সক্ষম। বাইরের আক্রমণ বলতে এখানে নির্দিষ্ট কোনো কিছু নয় এটি বিভিন্ন প্রকার রোগের জীবাণু হতে পারে, গলায় হাড় বিঁধে আটকে থাকতে পারে। কাঁটা আটকাতে পারে, দেহে গুলি প্রবেশ করে থাকতে পারে কিংবা কাঁচের কোনো অংশও হতে পারে—এসব ক্ষেত্রে সাইলেসিয়ার প্রভাব বিদ্যমান। প্রত্যেক এমন ব্যাধি যাকে বাইরের আক্রমণস্বরূপ প্রতিহত করা উদ্দেশ্য সে ক্ষেত্রে ইন্শা মাশাআল্লাহ্‌ আমি মনে করি সাইলেসিয়া কাজ করে এবং এর প্রয়োজন হয়। তবে এর ব্যবহারে কিছু সতর্কতাও অবলম্বন করা উচিত।

বায়োকেমিক প্রকৃতপক্ষে হোমিওপ্যাথিই বটে। কোনো কোনো হোমিও চিকিৎসক মনে করেন তারা বায়োকেমিকের মাঝে সীমাবদ্ধ থেকে সব ধরনের চিকিৎসা করতে সক্ষম। তাই এটি হোমিওপ্যাথির একটি ভিন্ন শাখায় পরিণত হয়েছে। হোমিও চিকিৎসকরা বায়োকেমিক ঔষধও ব্যবহার করেন কিন্তু বায়োকেমিক কেবল এই বারোটি ঔষধের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেন। সব ধরনের রোগের কার্যকর চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। কেননা, এমনও রোগ আছে যাতে ইলেকট্রোলাইটের ব্যবস্থা নষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও রোগের কারণে প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে কেবল বায়োকেমিকের মাধ্যমেই উপকার লাভ করা আবশ্যক নয়। উদাহরণ স্বরূপ টাইফয়েড। এটি এমন এক ব্যাধি যার বিষক্রিয়া পরিশেষে কিছুটা পক্ষাঘাতের লক্ষণাদি রেখে যায়। টাইফয়েডে আক্রান্ত অঙ্গ কখনো পুনরায় ঠিক হয় না। কেননা, এক্ষেত্রে স্নায়ুর মৃত্যু ঘটে। একবার স্নায়ু মরে গেলে কখনো তা আর ঠিক হয় না। পোলিওর চিকিৎসাও অত্যন্ত কঠিন। আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি টাইফয়েড আর পোলিওর যদি সঠিক চিকিৎসা করা হয় আর স্নায়ুতে যদি জীবনের কোনো স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেই বিন্দু থেকে জীবন নিজের প্রতিরোধ আরম্ভ করে দেয়। আর ধীরে ধীরে রোগের প্রভাব মিটতে আরম্ভ করে। একবার পোলিও আক্রান্ত এক কিশোরকে আমার কাছে আনা হয়। তার পা দু'টো পরস্পর প্রায় জোড়া লাগার মত হয়ে গিয়েছিল। আমি কিছুদিন তার চিকিৎসা করলাম। ছয় মাস পর সেই রোগীকে যখন আনা হলো তখন সে আল্লাহ্‌র রহমতে হাঁটতে পারতো। এখন সেই ছেলে জার্মানীতে থাকে এবং অনেকাংশে সেরে উঠেছে, রোগের সামান্য চিহ্নই কেবল এখন বিদ্যমান। অনুরূপভাবে একবার টাইফয়েডে আক্রান্ত এক মহিলা স্ক্রাচে ভর করে আমার কাছে আসেন আর জানান যে, শৈশব কালে টাইফয়েডে আক্রান্ত হবার পর থেকে তার একটি পা শুকিয়ে যেতে থাকে। তিনি গোড়ালির কাপড় তুলে আমাকে এমন শুকনো একটি পা দেখান যা অনায়াসে দু'টো আঙ্গুলের মুষ্টির মধ্যে এসে যাবে। অপর পা আর শরীরের অবশিষ্টাংশ স্বাভাবিকই ছিল তবে দ্বিতীয় পা-টা দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল, স্ক্রাচের সাহায্য ছাড়া তার দাঁড়ান সম্ভব ছিল না। তাকে আমি সালফার ২০০ এবং রাসটক্স ২০০ দিলাম। এই চিকিৎসা পত্রটি অবশ্য আমি কোনো বইতে পড়ি নি কিন্তু আমি এদের প্রকৃতি বুঝে কাজ করেছি। সাধারণ চিকিৎসকরা যে সব ঔষধ দিতেন তাতে আরোগ্য হতো না, তাই বাধ্য হয়ে আমাকে ঔষধের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে নিজের পক্ষ থেকে সূত্র উদ্ভাবন করতে হয়েছে। রাসটক্স ( Rhustox ) চর্ম রোগের ঔষধ হওয়া সত্ত্বেও এটি পক্ষাঘাতের ক্ষেত্রেও যে অসাধারণ ক্রিয়া প্রদর্শন করে এটি আমি লক্ষ্য করেছি। গভীর পক্ষাঘাতের মন্দপ্রভাব দীর্ঘায়িত হয়ে থাকলেও রাসটক্স উপকারী। সালফারও ( Sulphur ) এক অতি গভীর প্রভাব বিস্তারকারী ঔষধ। আমার মস্তিষ্কে হযরত মসীহ মাওউদ ( আঃ )-এর সেই কথার বড়ই গভীর প্রভাব ছিল যার কারণে এই দুই ঔষধের নাম আমার মাথায় এসেছিলো। হুযূর ( আইঃ ) বলেছেন :

আধ্যাত্মিক পন্থায় আমায় জানানো হয়েছে যে, যে সব ব্যাধি মানব দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহে আক্রমণ করে যদি কোনক্রমে সেই রোগকে চর্মের উপরে স্থানান্তরিত করা যায় তবে অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা পায়। এই নীতির আলোকে আমি অনেক চিকিৎসা আবিষ্কার করেছি। রাসটক্স চর্মরোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এবং এটি অংগ-প্রত্যংগের উপর আক্রমণ করে। আমার মনে পড়ল যে সব রোগ ব্যাধির প্রভাব চর্মের উপরে প্রকাশিত হয় আর শরীরের অভ্যন্তরীণ ঝিল্লীকেও প্রভাবিত করে এমন ব্যাধিতে সালফার, রাসটক্স আর এদেরই সদৃশ ঔষধ উপকারী সাব্যস্ত হবে। টাইফয়েড শেষ সীমায় পৌঁছালে মানব শরীরে আঁচিলের মতো সরু সরু সুতার মত বেরিয়ে আসে। এটি টাইফয়েডের শক্তি নিঃশেষ হবার চিহ্ন। অর্থাৎ রোগের আবর্জনা/দূষিত অংশ বাইরে বেরিয়ে এসেছে। যদি চর্মে এই আলামত প্রকাশিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে টাইফয়েড কোনো না কোনভাবে ভেতরেই চাপা আছে। এদিকেই আমার চিন্তা প্রবাহিত হয় আর আমি উল্লেখিত দুইটি ঔষধ এক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখি। আমি সেই মহিলাকে বল্লাম একদিকে ঔষধ খেতে থাকো অন্যদিকে পায়ের শুকিয়ে যাওয়া অংশকে মাপতে থাকো। যদি শুকিয়ে যাওয়া অংশ বৃদ্ধি লাভ করে তাহলে নিশ্চিত জেনো তুমি খোদার ফযলে আরোগ্য লাভ করছো। মহিলা এরপর নিজ গ্রামে ফেরত চলে যায়। মাস ছ'য়েক পর সে আবার এলো। তার হাতে কোনো স্ক্র্যাচ ছিল না। নিজে বারান্দা দিয়ে হেঁটে এলো আর বলল, "আমি একেবারে ভাল হয়ে গেছি, আলহামদুলিল্লাহ্।" টাইফয়েডে চিকিৎসা অতি সাবধানতার সাথে করা উচিত এবং এই রোগকে মোটেও সহজভাবে নেয়া ঠিক না। কেননা, একবার যদি এই রোগ মস্তিষ্কে আক্রমণ করে তাহলে এর কোন চিকিৎসা আমাদের জানা নেই। আল্লাহ্‌র জানা আছে কেননা এমন কোনো রোগ নেই যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা হয় নি। প্রত্যেক ব্যাধির জন্য দেহের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ ক্ষমতার সম্ভাবনা বিদ্যমান। একে একবার জাগ্রত করতে পারলে আল্লাহ্‌র ফযলে রোগ প্রতিরোধের যোগ্য হয়ে যায়। তবে একটি বিষয় এটি প্রতিহত করতে পারে না এবং তা হলো আল্লাহ্‌র তক্‌দীর। কোনো হোমিও চিকিৎসক যদি দাবী করেন যে, আমি প্রত্যেক রোগকে কাবু করতে পারি আর প্রতিটি ব্যাধি আমার আয়ত্তে তাহলে এটা একদম মিথ্যা কথা। আল্লাহ্‌তা'লা কোনো মানুষের জন্য যে স্বাভাবিক আয়ু নির্ধারণ করেছেন, সে পর্যন্ত পৌঁছাতে হোমিওপ্যাথি সর্বোত্তম সহায়তা প্রদান করতে পারে। টেনে হেঁচড়ে আর কষ্ট করে উপনীত না হয়ে কর্মক্ষমতা আর উচ্ছলতার সাথে জীবনের শেষ প্রান্তে যেতে দোষ কি ?

হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতিতে খাদ্যাহারের বিষয়ে কোনো বিধি নিষেধ নেই। সাধারণতঃ হোমিও ঔষধ সব ধরনের খাদ্যাহার সত্ত্বেও পূর্ণ প্রভাব প্রদর্শন করে এবং এর কাজে কোন বিঘ্ন ঘটে না। তবে প্রকৃতপক্ষে রুগীকে সেইসব খাদ্যাহার পরিহার করা উচিত যার কারণে তার কষ্ট বাড়ে আর যা তার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

## হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সংরক্ষণ করার পন্থা ঃ

হোমিও ঔষধ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেও নষ্ট হয় না। শতবর্ষের বেশী সময় পড়ে থাকা সত্ত্বেও নিজের গুণাগুণ বজায় রাখে। তবে এগুলো শীতল ও শুষ্ক স্থানে রাখা উচিত। সাধারণতঃ তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ঔষধ নষ্ট হয় না তবে ঔষধ যদি টিংচার রূপে হয় আর ছিপি যদি সতর্কতার সাথে বন্ধ না করা হয় তাহলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ঔষধ শেষ হয়ে যায়। শিশি একেবারে শুষ্ক হয়ে গেলে নতুন করে ঔষধ বানানো উচিত কিন্তু এক ফোঁটা ঔষধও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে তার মধ্যে দ্রবণ মিশিয়ে আবার ঔষধ বানানো যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় ঔষধের পোটেনসি ১ গুণ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ৩০ এর স্থলে ৩১ হবে কিংবা ২০০ এর স্থলে ২০১ হবে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এতে কোনো তারতম্যের সৃষ্টি হবে না।

হোমিও ঔষধ যেন সরাসরি রৌদ্রে রাখা না হয় এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেননা, সূর্যরশ্মির কারণে এসব ঔষধের গুণাগুণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ঔষধের খালি শিশি বোতল যদি পুনরায় ব্যবহার করতে হয় তাহলে ওগুলো পানিতে ফুটিয়ে কাপড় দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে রোদে রেখে দিন যেন প্রথম ঔষধের প্রভাব মুছে যায়।

সমস্ত ঔষধ পৃথক পৃথক শিশিতে রাখা উচিত। প্রয়োজনের সময় একাধিক ঔষধ মিশানো যেতে পারে। তবে স্থায়ীভাবে ঔষধ মিশ্রিত আকারে রাখা ঠিক নয়। যদিও কতিপয় ঔষধকে চিকিৎসার ব্যবস্থাস্বরূপ মিশ্রিত আকারে রাখলে কোন নেতিবাচক প্রভাবের সৃষ্টি হয় না তথাপি যেসব ঔষধ একে অপরের প্রভাবকে বিনষ্ট করে এবং পরস্পর সমপ্রকৃতির নয় সেগুলোকে পৃথক পৃথক রাখা বাঞ্ছনীয়। স্থায়ীভাবে ঔষধ মিশিয়ে রাখার চেয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী টাটকা মিক্সচার বানানো অনেক উত্তম। ঔষধকে তীব্র সুগন্ধির প্রভাব থেকে রক্ষা করা উচিত। কর্পূরের সুগন্ধ হোমিও ঔষধের প্রভাবকে বিনষ্ট করে দেয়। যদি বাতাসে কোন সুগন্ধি ভেসে বেড়ায় তা সাধারণতঃ ঔষধকে প্রভাবিত করে না তবে আকস্মিক সুগন্ধির সান্নিধ্যে যেন হোমিও ঔষধ না আসে এই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

---

ভূমিকা পর্ব এখানেই শেষ। আগামী সংখ্যা থেকে ঔষধের গুণাগুণ, প্রভাব ও এর প্রকৃতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

অনুবাদ : আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী

---

( ৫১ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ )

জামাত অনেক অনেক গৌরবোজ্জ্বল সফলতা অর্জন করেছে ;

সুতরাং আসুন আমরা সকলে যুগ-নূহের নৌকায় আরোহণ করি এবং নিরাপত্তায় নিশ্চয়তা লাভ করি। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ইতোপূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' ( আইঃ ) জামাতের লোকদেরকে বেশী বেশী কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তক পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তদনুযায়ী আমল করতে বলেছিলেন।

# সম্পাদকীয়

## যুগ-নূহের কিশতিতে আরোহন করুন!

আল্লাহ্‌তা'লার একজন বিশিষ্ট শরীয়তবাহী নবী হলেন হযরত নূহ আলায়হেস সালাম। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তিনি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে নিয়ে আসার জন্যে বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টা করলেন কিন্তু তারা তাঁর কথায় সকলে সাড়া দিল না। অধিকাংশ লোক তাঁর বিরোধিতা করলো। তাঁকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করলো। পরে তিনি আল্লাহ্‌তা'লার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করে দোয়া করলেন। তাতে কাজ হোল না। আল্লাহ্‌তা'লার তকদীর তাদেরকে শাস্তি দিতে মনস্থ করলেন। আল্লাহ্‌তা'লা হযরত নূহের অনুসারীদের রক্ষাকল্পে হযরত নূহ (আঃ)-কে একখানা নৌকো তৈরী করতে বল্লেন। নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সেখানে প্লাবন দেখা দিলো। হযরত নূহ (আঃ)-এর অনুসারীরা নৌকোয় চড়ে রক্ষা পেলেন এবং অন্যেরা ডুবে মারা গেল; এমন কি হযরত নূহের ছেলে তাঁকে না মানার কারণে ডুবে মারা গেল।

বর্তমান যুগে মানবতা যখন চরম অবক্ষয়ের প্লাবনে হাবু-ডুবু খাচ্ছিলো তখন আল্লাহ্‌তা'লা এ যুগের নূহ যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আর্তমানবতাকে রক্ষার জন্যে একখানা কিশ্‌তি বা নৌকো তৈরী করতে বল্লেন। এ কিশ্‌তি কোন লোহা, কাঠ বা ধাতব পদার্থে তৈরী নয়—এ কিশ্‌তি হলো তাঁর কুরআন ও সুন্নাহ্‌ ভিত্তিক শিক্ষা যা তিনি তার বিখ্যাত কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তকে সন্নিবেশ করছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এ শিক্ষানুযায়ী যারা তাদের জীবন নির্বাহ করবেন তারা তাঁর আধ্যাত্মিক গৃহের অধিবাসী বিধায় তাদেরকে রক্ষা করা হবে। যেমন, ইলহাম মারফত আল্লাহ্‌ তাঁকে অবহিত করেছেন—'ইন্নী উহাফিযু কুল্লা মান্‌ ফিদ্দার' অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে যারা রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করা হবে। আল্লাহ্‌তা'লার এ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পাঞ্জাবের বিভীষিকাপূর্ণ প্লেগের দিনে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অনুসারী আহমদীগণ রক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইতিহাস তার সাক্ষী।

আল্লাহ্‌তা'লা কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আজকের দুনিয়াতে আমরা যে অবক্ষয়ের প্লাবনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি, আজকেও আমরা যদি রক্ষা পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে যুগ-নূহের কিশ্‌তিতে আরোহণ করতে হবে। নূহ (আঃ)-এর পুত্র যেমন তাঁর পুত্র হওয়ার সুবাদেও রক্ষা পায় নি। তেমনি শুধুমাত্র আহমদী নাম ধারণ করার কারণে আমরাও রক্ষা পাবো না। যুগ-নূহের শিক্ষার আলোকে আমাদের পরিপূর্ণভাবে আলোকিত হতে হবে নচেৎ আমাদের জন্যে যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ৮ই আগষ্ট '৯৭ তারিখের খুতবায় বলেছেন—আপনারা যদি এই নৌকায় আরোহণ করেন তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাদের অণু পরিমাণও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তারা আপনাদের সামনে দেখতে দেখতে একের পর ডুবতে চলে যাবে। ইহা সেই তকদীর (অবধারিত বিষয়) যাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা দুনিয়ার কারো কাছে নেই; ইহা সেই তকদীর যাকে লক্ষ্য রেখে আমি মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম; এর ফলে এ বৎসর আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে

(অবশিষ্টাংশ ৫০ পৃঃ দেখুন)

15th Issue
Fortnightly **THE AHMADI** 15th September, 1997
রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

MUSLIM
MTv
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

**MTA AUDIO CHANNELS**

| | |
|---|---|
| * Main | : 6.50 MHz |
| * English | : 7.02 MHz |
| * Arabic | : 7.20 MHz |
| * Bangla | : 7.38 MHz |
| * French | : 7.56 MHz |
| * German | : 7.74 MHz |
| * Indonesian | : 7.92 MHz |
| * Turkee | : 8.10 MHz |

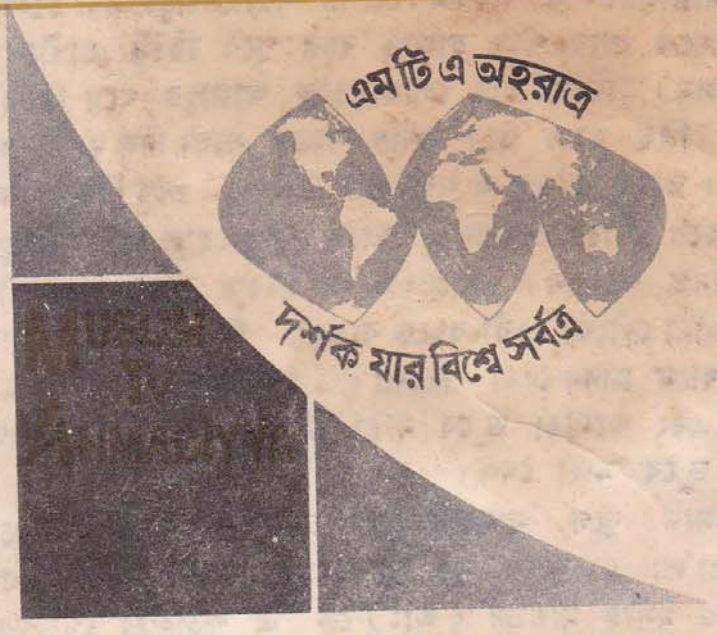


- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ**
৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272